সুকুমার

(ও আর চারিটি গল্প)

শ্রীফণীন্দ্রনাথ পাল বি, এ,

প্রকাশক

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ

৫১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

১৩২৩

মূল্য এক টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীকুলচন্দ্র দে
"শাস্ত্রপ্রচার প্রেস"—৫নং ছিদামমুদির লেন, কলিকাতা।

উপহার পৃষ্ঠা

এই গ্রন্থখানি

আমার

কে

দিলাম

তারিখ

সন

শ্রী

সূচী

বঙ্গভাষার নীরব সাধক সুহৃদ্বর

হয়বৎনগরের প্রসিদ্ধ জমিদার

শ্রীযুত মসনদ আলী দেওয়ান

আলীম দাদখান সাহেবকে

প্রীতি-উপহার স্বরূপ

প্রদত্ত হইল

২৬।৩ স্কটস্ লেন,
কলিকাতা
৪ঠা মাঘ, ১৩২৩

যমুনা

(সচিত্র মাসিকপত্রিকা)

৫১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুকুমার

[১]

রাজকিশোরের শ্যালক গঙ্গাধরবাবু বেশ অবস্থাপন্ন লোক। ভাগলপুরের বাঙ্গালীটোলায় তাঁহার বাস।

রাজকিশোর চাকরির খাতিরে ভাগলপুরে আসিয়াছিলেন। তিনি সরকারী আপিসে আশী টাকা বেতনে চাকুরী করিতেন। প্রায় বৎসর দুই পূর্ব্বে তিনি যখন প্রথম ভাগলপুরে বদলি হইয়া আসেন, তখন তিনি শ্যালকেরই বাটী আসিয়া উঠিয়াছিলেন। ইচ্ছা ছিল, এক সঙ্গেই থাকিবেন, কিন্তু সপ্তাহখানিক সেখানে কাটাইবার পর তাঁহাকে সে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া পৃথক্ বাসা লইতে হইয়াছিল। গঙ্গাধরবাবু সে সময় দুই একবার মৌখিক আপ্যায়িত করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আবার আলাদা বাসা ক'রে মিথ্যামিথ্যি খরচ

বাড়ান কেন?" গঙ্গাধরবাবুর পত্নী হাসিয়া বলিয়াছিলে "আমরা গরীব মানুষ, আমাদের মত খাওয়া দাওয়া ঠাকুরজামাই পোষাবে কেন?" এই পর্য্যন্ত!

রাজকিশোরবাবুর চরিত্র তাঁহার শ্যালকের ঠিক বিপরীত ছি খরচপত্র সম্বন্ধে তাঁহার কোন বাঁধা বাঁধি নিয়ম ছিল না। তি যাহা পাইতেন, তাহাই খরচ করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার বৎসরের কন্যা জ্যোৎস্না, পনর বৎসরের পুত্র সুকুমার ও পত্নীকে লইয়া তাঁহার সংসার। তাঁহার পুত্র কন্যা দুইটীর খাওয়ার দিকে ঝোঁকটা কিছু বেশী ছিল। যখন যে জিনিষটী তাহারা খাইতে চাহিত, রাজকিশোরবাবু তৎক্ষণাৎ তাহাই আনাইয়া দিতেন তাঁহার রামভরত ওরফে রামু বলিয়া এক বালক-ভৃত্য ছিল। জ্যোৎ ও সুকুমারের জন্য যখন যাহা কিছু আসিত, রামুর জন্যও তাহা আসিত। গঙ্গাধরবাবু একদিন তাই দেখিয়া বলিলেন, "ও রাজকিশোরবাবু, অতটা ভাল না, একটু রয়ে বসে চ'ল।" রাজ কিশোর হাসিয়া কহিলেন, "আমি ও কিছুতেই পেরে উঠি না। আমার ছেলেমেয়েরা খাবে, আর ও যে হাঁ করে চেয়ে থাকবে এ আমি কিছুতেই দেখ্‌তে পারি না।" গঙ্গাধরবাবু বলিলেন "সংসারটা একটু চেন ভায়া, সংসারটা একটু চেন।"

আর একদিন সন্ধ্যার সময় গঙ্গাধরবাবু রাজকিশোরের বাটীর বারান্দায় বসিয়া রাজকিশোরের সহিত গল্প করিতেছিলেন, এমন সময় জ্যোৎস্না আসিয়া কহিল, "কই বাবা, আজ কমলালেবু ত

আন্‌লে না ?" রাজকিশোর হাসিয়া কহিলেন, "এই যা, ও কথা একেবারে ভুলেই গেছি। যা ত মা রামুকে ডেকে আন দেখি, আমি এখনই চারটে লেবু আন্‌তে দিই।" জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বলিল, "তুমি ত বেশ যাহ'ক বাবা, চারটেতে কি ক'রে হ'বে ! দাদার একটা, রামুর একটা, তোমার একটা, মার একটা, মামাবাবুর একটা, আমার একটা—হিসেব ক'রে দেখ দিকি কটা হয়, ছটা হয় না বাবা ? আচ্ছা তুমি আমায় একটা টাকা দাও, আমি রামুকে আনতে দিইগে।" রাজকিশোরবাবু সম্মুখের টেবিলের উপরের ক্যাসবাক্স খুলিয়া একটা টাকা বাহির করিয়া কন্যার হাতে দিলেন, সে চলিয়া গেল। গঙ্গাধরবাবু এতক্ষণ অবাক্ হইয়া ইহাদের কাণ্ড দেখিতে ছিলেন। এ সময়টা কমলালেবুর সময় না, একটা লেবু খুব কম হইলেও ছ'পয়সার কমে পাওয়া যাইবে না। গঙ্গাধরবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তোমার এ কাণ্ডখানা কি ? এই অসময়ে এক রত্তি মেয়ের কথায় লেবু কিন্‌তে অমনই একটা টাকা ফেলে দিলে। তা ছাড়া মেয়েছেলেকে এত আদর দেওয়াও ভাল না, ওতে তাদের ক্ষতিই করা হয়, কোন উপকার করা হয় না।" রাজকিশোর হাসিয়া কহিলেন, "ও ত দুদিন বাদে পরের বাড়ী চ'লে যাবে, আর ক'দিনই বা ও আব্‌দার করবে।" গঙ্গাধরবাবু আর কিছু বলিলেন না।

রামু আসিয়া যখনই সংবাদ দিত, 'দিদিমণি আজ বাজারে অমুক জিনিষটা উঠেছে,—সেটা খুব ভাল দিদিমণি', জ্যোৎস্না অমনই

পিতার নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া আনিয়া রামকে দিয়া তাহা কিনিয়া আনিত। সুকুমারও পথে বাহির হইলে একটা যাহ'ক কিছু না কিনিয়া কোন দিন সুধু হাতে ফিরিত না। এমনই করিয়া বড় আনন্দে দুইটী ভ্রাতাভগিনীর দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছিল।

এমন সময় সহসা একদিন কাল-বৈশাখের আকাশের মত তাহাদের জীবন ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সেবার ভাগলপুরে দুর্দ্দান্ত প্লেগ যে মহামারির সৃষ্টি করিল, তাহাতে তিন দিনের মধ্যে জ্যোৎস্না ও সুকুমার স্নেহময় জনকজননী হারাইয়া অনাথ হইল। হায়, তাহাদের জন্য আহা বলে, এক গঙ্গাধরবাবু ভিন্ন অপর একজন আত্মীয় কেহ ছিল না। তাহারা অনন্যোপায় হইয়া মাতুল গঙ্গাধরবাবুরই গলগ্রহ হইল।

[২]

প্রায় মাসদেড়েক পরে একদিন ভোরবেলায় জ্যোৎস্না শুষ্ক নিরানন্দমুখে তাহার মাতুলগৃহের বারান্দায় বসিয়া আকাশের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, তাহার পিতামাতা বোধ হয় ঐ আকাশের মধ্যে কোথায় রহিয়াছেন। সে প্রাণপণ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাদের খুঁজিতে লাগিল, কিন্তু হায়, কোথায় তাঁহারা? জ্যোৎস্নার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইয়া আসিল। কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছিতে মুছিতে সে ভাবিল,—সে দেখিতে পাইল না বটে, কিন্তু তাহার জনকজননী তাহাকে নিশ্চয়ই দেখিতে

পাইতেছেন। এমন সময় তাহার মাতুলপত্নী কুমুদিনী সেখানে আসিয়া কহিল, "কি মেয়ে গা বাছা তুই, সারা বাড়ীময় তোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, আর তুই কি না বারান্দার কোণে ব'সে এখনও হাওয়া খাচ্ছিস্। ঘরদোর ঝাঁট দেবে কে, জানিস্ ত কাল চাকরটাকে জবাব দিয়েছি।"

জ্যোৎস্না মাতুলানীর মুখের দিকে দুইটী জলভরা আয়ত চক্ষুর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কহিল, "কাল রাত্তিরে ঝাঁট্ দিয়ে আমার হাতে ফোস্কা পড়ে গেছে মামিমা, আমি আর ঝাঁট্ দিতে পারব না, আমার হাতে লাগ্‌বে যে।"

কুমুদিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "দেখ কথার শ্রী, তাহ'লে ঘরদোর গুলো কি এমনই পড়ে থাক্‌বে, ঝাঁট্ পড়্‌বে না। কি শিক্ষায় তোর বাপমা দিয়ে গিয়েছে!"

জ্যোৎস্না কহিল, "বাবা আমাকে কখনও ঝাঁটায় হাত দিতে দিতেন না।"

কুমুদিনী ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া কহিল, "সে বাবা ত আর ফিরে আস্‌বে না—এখন তোকে রোজই ঝাঁটা ধর্‌তে হ'বে। আমরা ত তোর বাবার মত বড় লোক না, যে, তোদের দু'দুটো ভাইবোনকে বসে বসে খাওয়াব। আমার সোজা কথা, আর তোর মামাও সে ব্যবস্থা করে দিয়েছে, তাই চাকরটাকে কাল ছাড়িয়ে দিয়েছি,- তুই আর সুকো দু'জন মিলে তার কাজ কর্‌বি তুই ঝাঁট দিবি, ঘরের পাট কর্‌বি, আর সুকো বাজারহাট করবে।"

জ্যোৎস্না মুখখানি এতটুকু করিয়া কহিল, "দাদা বাজারহাট কর্‌বে কেন? দাদা কি চাকর! আমরা চাকরের কাজ কেন করতে যাব মামিমা, আমরা ত তা কর্‌ব না।"

কুমুদিনী হাত মুখ নাড়িয়া বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "কি আমার নবাবের বেটাবেটী—ওরা দু'জনে দু'বেলা বসে বসে ভাত গিল্‌বেন—আর আমরা মর্‌ব খেটে। বলি একরত্তি মেয়ের ত খুব লম্বা লম্বা কথা—একবার ভেবেছিস্ কি, দু'বেলা ভাত জুটবে কোত্থেকে?"

জ্যোৎস্না হাঁ করিয়া মাতুলানীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কে যেন তাহাকে জানাইয়া দিয়া গেল, ওরে তোদের যে বাপমা নাই, তোরা যে নিরাশ্রয় অনাথ; কে তোদের মুখ চাহিবে,—তোদের কষ্টে কাহার হৃদয় গলিবে!

এমন সময় সুকুমার একখানি গামছা হাতে করিয়া সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মামিমা, মামাবাবু বাজারে যেতে বল্লেন, পয়সা দাও।"

কুমুদিনী কহিল, "তোর ত দেখছি তবু বুদ্ধিশুদ্ধি আছে—আর ঐ নবাবের বেটী তোর বোনের কথা শোন—ও বলে কিনা আমার দাদা কি চাকর।"

সুকুমার এতক্ষণ জ্যোৎস্নার মুখের দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখে নাই। এইবার তাহার মাতুলানীর কথায় ভগিনীর মুখের দিকে চাহিতেই দেখিল, জ্যোৎস্না অঞ্চলে দুই চোখ ঢাকিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে।

কুমুদিনী অমনই বলিয়া উঠিল, "ওই দেখ তোর বোনের আদিখ্যেতা, কি বলা হ'য়েছে ওকে যে ও একেবারে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্‌লে, এখন দেখ্‌ছি সোজা কথার দিন না। তুই তোর ঐ বোন্‌কে বোঝা, শুধু বসিয়ে কে কাকে খেতে দিয়ে থাকে। আমি ততক্ষণ বাজারের পয়সা বের করে আনি।"

কুমুদিনী চলিয়া গেলে সুকুমার ভগিনীর আরও নিকটে গিয়া স্নেহের স্বরে কহিল, "কেন কাঁদছিস্ জোছনা?" সুকমার অতি কষ্টে তাহার চোখের জল রোধ করিল।

জ্যোৎস্না মুখ হইতে অঞ্চল সরাইয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "তুমি দেখ না দাদা আমার হাতখানা, কত বড় ফোস্কা পড়েছে, আমি দাদা আজ কিছুতেই ঘর ঝাঁট দিতে পারব না। না হয় নাই খেতে পাব --আমি কিছুতেই চাকরের কাজ করব না। তুমি বল না দাদা, আমরা কি চাকর?"

এ কথার সুকুমার কি উত্তর দিবে! অতি শৈশব হইতেই জ্যোৎস্না যে কিরূপ অভিমানিনী সুকুমার তাহা বিশেষরূপে জানিত। তাহার বাপ মা বাঁচিয়া থাকিতে সামান্য একটু কারণে জ্যোৎস্নার অভিমান হইত। তাহার জনকজননীকে কত রকম করিয়া তাহার সেই দুর্জ্জয় অভিমান ভাঙ্গিতে হইত। কিন্তু আজ! হায়, সে কি করিয়া বুঝাইবে, তাহার বোনটির অভিমান করিবার দিন ফুরাইয়া গিয়াছে। সে অভিমান করিয়া দিন রাত্রি অনাহারে পড়িয়া থাকিলেও, কেহ তাহাকে উঠিতে বলিবে না, খাইতে ডাকিবে না।

সুকুমার চোখের জলের মধ্য দিয়া নানারকম করিয়া জ্যোৎস্নাকে বুঝাইয়া বাজার করিতে চলিয়া গেল।

ঘণ্টা খানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া বাজার নামাইয়া দিয়া সুকুমার ভগিনীর সন্ধান করিতে করিতে দেখিল, অদূরে সেই বারান্দার কোণটিতে বসিয়া সে চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। সুকুমার মনে করিল, জ্যোৎস্না ঝাঁট দেয় নাই বলিয়া মামিমা নিশ্চয়ই গালমন্দ করিয়াছে, তাই সে কাঁদিতেছে। সুকুমার ব্যথিত কণ্ঠে ডাকিল, "জোছনা!"

জ্যোৎস্না তাহার সুকোমল হাতখানি তাহার দাদার দিকে বাড়াইয়া দিয়া কহিল, "দেখ দিকি দাদা, হাতটা কি হ'য়েছে!"

সুকুমার চাহিয়া দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কাল রাত্রির সেই ফোস্কা গলিয়া গিয়াছে। কচি হাতখানা একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে।

জ্যোৎস্না আবার কহিল, "তুমি বল্‌লে তাই ঝাঁট দিয়েছি দাদা, না হ'লে ত আমি কখ্‌খনও দিতাম না, না হয় নাই খেতে দিত।"

সুকুমার পাষাণের অপেক্ষাও কঠিন হইয়া চোখের জল রোধ করিয়া স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। হায়, সে যে তখন কোন সান্ত্বনার কথাই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। এমন সময় ঘরের ভিতর হইতে তাহার মামিমা ডাকিয়া কহিল, "ওরে ও সুকো, তোর আক্কেলটা কি বল্‌দিকি শুনি, আমি কতক্ষণ তোর জন্যে হাঁ করে বসে থাক্‌ব—আমার কি আর কাজকর্ম্ম নেই।

বাজারটা ফেলে দিয়ে যে চলে গেলি, হিসেব দেবে কি আর একজন এসে।"

জ্যোৎস্না তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "তুমি যাও দাদা শীগ্‌গির, না হ'লে বড্ড বক্‌বে।"

সুকুমার স্নেহময়ী ভগিনীর মুখের দিকে চাহিতে পারিল না, নীরবে সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল। হিসাব দিতে গিয়া কিন্তু সে ভারি গোলে পড়িল। এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে হিসাব দেওয়া নূতন কথা, ইতিপূর্ব্বে সে কোন দিন এ ভাবে গৃহস্থালীর বাজার করে নাই। তাই পদে পদে তাহার ভুল হইতে লাগিল। যে জিনিষটা সে দুই পয়সায় কিনিয়াছে, সেটা হয় ত এক পয়সা বলিয়া ফেলিল, আবার কোন জিনিষ তিন পয়সায় কিনিয়া চার পয়সাও বলিল। তাহার মামিমা কেবল গম্ভীর হইয়া ঘাড় দোলাইতে দোলাইতে বলিতে লাগিল, "বলে যা, বলে যা, দেখি তোর দৌড় কতদূর।" সুকুমার প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কোন রকমে হিসাব মিলাইতে পারিল না। কখনও বা আসল হইতে বেশী হইতে লাগিল, কখনও বা কম পড়িয়া গেল। কুমুদিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ঢের হ'য়েছে, আর হিসেব দিয়ে কাজ নেই,—সব বোঝা গেছে, এখন ক'পয়সা সরালি বল্‌দিকি?" সুকুমারের চোখ মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে মনে মনে আবার হিসাব করিতে লাগিল। এইবার তাহার সব ঠিক মিলিয়া গেল। সে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "তুমি ধর মামিমা, আমি সব হিসেব মিলিয়ে দিচ্ছি।" এই

বলিয়া সে আবার হিসাব দিতে লাগিল। কিন্তু শেষ অবধি সে মিলাইতে পারিল না, আবার গোল হইয়া গেল। কুমুদিনী এবার অত্যন্ত রাগিয়া কহিল, "ওরে কাকে তুই বোঝাতে যাচ্ছিস্, কটা পয়সা চুরি করেছিস্ বলে ফেল, তা হ'লে আমিই তোর হিসেব মিলিয়ে দিতে পারব।"

জ্যোৎস্না ইতিমধ্যে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল সে তখনই বলিয়া উঠিল, "ইস্ আমার দাদা চোর হ'তে যাবে কেন। তুমি ত বেশ মামিমা, অমনই মিথ্যে করে আমার দাদাকে চোর বল্লে।"

কুমুদিনী হুঙ্কার দিয়া কহিল, "কি বল্লি, আমি মিথ্যেবাদী! ভাই করলে চুরি, বোন আবার এসেছে সাপাই গাইতে। ডাক্‌ছি তোর মামাকে, সোহাগের ভাগ্নে ভাগ্নীর যাহ'ক একটা বিহিত করে দিয়ে যাক্।"

এমন সময় কুমুদিনীর মধ্যম পুত্র হেবো সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিল, "কি হয়েছে মা?"

কুমুদিনী তখনও গর্জ্জন করিতেছিল, "এতটুকু মেয়ের ত আস্পর্দ্ধা কম নয়—আমার মুখের ওপর বলে কিনা আমি মিথ্যেবাদী, আসুক সে একবার।"

তাহার পুত্রটি কহিল, "জ্যোৎস্না তোমার মিথ্যেবাদী বলেছে বুঝি?"

কুমুদিনী কহিল, "হ্যা রে হ্যাঁ।" এদিকে গঙ্গাধরবাবুর

আসিতে বিলম্ব হওয়ায় কুমুদিনীর উত্তরোত্তর রাগ বৃদ্ধি পাইতেছিল। সে চীৎকার করিয়া কহিল, "ও আসবার দরকারই বা কি, যখন এদের এখানে রাখ্‌তেই হ'বে, তাড়াতে পারব না, তখন এদের শাসনের ভার আমাকেই নিতে হ'বে, ওরে অ হেবো দে ত ছুঁড়িটার দু'কান মলে।"

হেবো ত তাহাই চাহিতেছিল। সে তাড়াতাড়ি গিয়া সজোরে জ্যোৎস্নার কান দুটি চাপিয়া ধরিল। জ্যোৎস্না তাহার হাত ছাড়াইয়া দিতে গেলে সে তাহার চুলের মুঠি ধরিয়া টানিতে লাগিল। জ্যোৎস্না তখন দুই হাতে তাহাকে ঠেলিতেই সে মেঝের উপর পড়িয়া গেল, কিন্তু তখনই আবার উঠিয়া জ্যোৎস্নাকে ধরিয়া কিল চড় লাথি মারিতে আরম্ভ করিল। জ্যোৎস্না তাহাকে প্রাণপণ বাধা দিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু না পারিয়া কাঁদিয়া উঠিল, "ও দাদা আমায় মেরে ফেল্লে, ও দাদা আমায় মেরে ফেল্লে।"

সুকুমার এতক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ভগিনীর কাতর ক্রন্দনে সে চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং অগ্রসর হইয়া হেবোকে সরাইয়া দিল। ততক্ষণে গঙ্গাধরবাবু সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন; কি যে ব্যাপার হইয়াছে, তিনি তাহা বুঝিয়া উঠিতে না পারিয়া বলিলেন, "এ সব কি হ'চ্ছে?"

কুমুদিনী কহিল, "হ'চ্ছে আমার মাথা আর মুণ্ডু কি বজ্জাত ছেলে মেয়ে গা—দু'জনে মিলে হেবোকে কি মারটাই মারলে, এখন তুমি এর একটা বিহিত ব্যবস্থা কর বাপু।"

গঙ্গাধরবাবু খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া কহিলেন, "মার-ধোরে কাজ নেই—ওদের দু'জনেরই এ বেলা খাওয়া বন্ধ করে দাও—তা হ'লেই তেজ কমে আসবে।"

সত্যসত্যই সে বেলা ভ্রাতাভগিনীকে অনাহারে কাটাইতে হইল। রাত্রে তাহাদের সম্মুখে রুটিগুলো ধরিয়া দিয়া কুমুদিনী কহিল, "কেমন তেজ কমে এসেছে ত, নাও গিলে পেট ঠাণ্ডা কর।"

[৩]

এমনই করিয়া সুকুমারের নূতন জীবন আরম্ভ হইল। সুখের গিরিচূড়া হইতে তাহারা একেবারে দুঃখের অন্ধকারময় তলদেশে আসিয়া পড়িল। ক্রমে ক্রমে সে জীবনও তাহাদের সহ্য হইয়া গেল। ঝাঁট দিলে জ্যোৎস্নার হাতে আর ফোস্কা পড়ে না। সুধু ডাল ও যাহ'ক একটা ঘাঁট দিয়া মোটা মোটা চালের ভাত খাইতে জ্যোৎস্নার আর চোখ দিয়া জল ঝরে না। যখন তখন হাবুর কিল চড় লাথি খাইলে জ্যোৎস্না আর তাহা ফিরাইয়া দেয় না। হাবুর কিল খাইয়া জ্যোৎস্নার নাক দিয়া রক্ত পড়ে, চড় খাইয়া সুকোমল গণ্ডদেশে রক্ত জমিয়া উঠে, তখন জ্যোৎস্না সুধু কোন এক নিভৃত স্থানে গিয়া চোখের জল ফেলে, সুকুমারের সম্মুখে সে আর কোনদিন কাঁদে না। অন্ধকার রাত্রে জ্যোৎস্না উঠানের একধারে যখন বাসনের গাদা লইয়া মাজিতে বসে, তখন তাহার বুক কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিলেও, সে আর দাদা দাদা বলিয়া

চীৎকার করিয়া উঠে না,—ঐ রাত্রিটাই যে তাহার দাদার একমাত্র পড়িবার সময়! মাঝে মাঝে বাজারের হিসাব দিবার সময় তাহার মামিমা যখন তাহার দাদাকে চোর বলিয়া গালি দেয়, তখন জ্যোৎস্না আর তাহার প্রতিবাদ করিয়া ঝগড়া করে না, শুধু ছলছল নেত্রে তাহার দাদার মুখের পানে চাহিয়া থাকে। প্রতিদিন রাত্রে সুকুমার যখন শুক্‌নো রুটিগুলো একটু নুন মাখাইয়া গিলিতে থাকে, তখন জ্যোৎস্না চোখের জলে বুক ভাসায়!

একদিন বৈকালে জ্যোৎস্না পাশের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল, বাড়ীর গৃহিণী তাহাকে আদর করিয়া দুইটি সন্দেশ খাইতে দিয়াছিলেন। সে তাহা খায় নাই, আঁচলে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল। রাত্রে সুকুমার যখন নিত্যকার সেই শুক্‌নো রুটি গিলিতেছিল, জ্যোৎস্না আঁচল হইতে সন্দেশ দুইটী খুলিয়া সুকুমারের হাতে দিল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "সন্দেশ কোথায় পেলিরে জোছ্‌না?"

জ্যোৎস্না কহিল, "নলিনার মা আমায় খেতে দিছ্‌লেন দাদা।"

সুকুমার সন্দেশ দুটো তাহার হাতে তুলিয়া দিয়া কহিল, "নে, সন্দেশ দুটো তুই খেয়ে ফেল।"

এমন সময় কুমুদিনী কোথা হইতে সেখানে আসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "সুকো তোর হাতে ও কি রে?"

সুকুমার ভীত হইয়া কহিল, "সন্দেশ।"

কুমুদিনী বিদ্রূপ করিয়া কহিল, "সন্দেশ না হ'লে বাবুর বুঝি এখন রুটি আর রোচে না। বলি এ সন্দেশ এল কোথ্‌থেকে?"

সুকুমার মুখখানি এতটুকু করিয়া কহিল, "জ্যোছনাকে মলিনার মা খেতে দিয়েছিলেন।"

কুমুদিনী কহিল, "তা ত হ'ল, তা তোর পাতে সন্দেশ এল কি করে ?"

সুকুমার কহিল, "জোছনা আমায় খেতে দিয়েছে।"

কুমুদিনী ঘাড় দোলাইয়া কহিল, "জ্যোছনা তা হ'লে খুব দাতা দেখ্‌ছি ত। বলি আমি কি কচি খুকী, কিছুই বুঝিনি। আজ বাজারের চারটে পয়সা গোলমাল করা হ'য়েছিল, তা বুঝি আমি ভুলে গেছি, সেই পয়সা চুরি করে এই সন্দেশ কেনা হয়েছে, কেমন বল্‌ দিকি সত্যি কিনা ?"

সুকুমার আড়ষ্ট হইয়া রহিল। জ্যোৎস্না আর সহ্য করিতে পারিল না, ক্রোধে ফুলিতে ফুলিতে কহিল, "মামিমা শুধু শুধু দাদাকে চোর বোল না, তুমি চল না আমার সঙ্গে, মলিনার মা আমায় সন্দেশ দিয়াছে কিনা জেনে আসবে।"

কুমুদিনী ঝঙ্কার দিয়া কহিল, "ওঃ, আমার ত ভারি গরজ পড়েছে এই রাত্তিরে ছুটে যাব মলিনাদের বাড়ী, কাল খাওয়া বন্ধ করে দিলেই এ চুরির শোধ হ'বে।" এই কথা বলিয়া সে হন্‌হন্‌ করিয়া চলিয়া গেল।

জ্যোৎস্না চোখের জল মুছিতে মুছিতে কহিল, "আমার জন্যে দাদা তোমায় চোর হ তে হ'ল।"

সুকুমার সমস্ত আঘাত সহ্য করিয়া লইয়া কহিল, "মামিমার

ওই চোর বলা কেমন একটা রোগ—তার জন্যে তুই দুঃখু করছিস্ কেন? নে সন্দেশ দুটো খেয়ে ফেল।"

জ্যোৎস্না কহিল, "না দাদা তুমি রুটি দিয়ে সন্দেশ দুটো খেয়ে ফেল—তুমি যে কি কষ্টে খাও তা ত আমি দেখতে পাচ্ছি।"

সুকুমার কহিল, "ও খেতে খেতে আমার বেশ অভ্যাস হ'য়ে গেছে, এখন ত শুক্‌নো রুটি বেশ লাগে।"

সুকুমারের এ কথার অর্থ বুঝিবার মত বয়স জ্যোৎস্নার হইয়াছিল। তাই অন্তরের আঘাত সহ্য করিয়া লইবার জন্য সে খানিকক্ষণ মৌন হইয়া রহিল।

সুকুমার আবার কহিল, "আচ্ছা এক কাজ কর, তুই একটা খা, আমি একটা খাই।"

তাহাই স্থির হইল বটে, কিন্তু সন্দেশ ভ্রাতা-ভগিনীর কাহারও গলা দিয়া গলিল না। মামিমার তীব্র গালিগালাজে সন্দেশ দুটো অত্যন্ত তিক্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

এই রকমের একটা-না-একটা আঘাত খাইতে খাইতে মাতুল-গৃহে তাহাদের বৎসর চারেক কাটিয়া গেল। জ্যোৎস্নার বয়স প্রায় ত্রয়োদশ অতিক্রম করিবার মত হইল। বাল্যকাল হইতেই তাহার বাড়ন্ত গড়ন ছিল, তাই বয়সের পক্ষে তাহাকে একটু বড়ই দেখাইত। সুকুমার এ বৎসর আই, এ পাশ করিয়া বি, এ পড়িতেছে।

[৪]

মাসখানেক পরে সুকুমার শুনিল, জ্যোৎস্নার বিবাহের কথা হইতেছে। তাহার মাতুলের আপিসের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের সদ্যঃপত্নীবিয়োগবিধুর এক বৃদ্ধের সহিত জ্যোৎস্নার বিবাহ প্রায় পাকিয়া উঠিবার মত হইয়াছে। বৃদ্ধ জ্যোৎস্নার অপরূপ লাবণ্য দেখিয়া উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠিয়াছেন।

সুকুমার তাহার মাতুল গঙ্গাধরবাবুকে কহিল, "মামাবাবু, হৃষীবাবুর সঙ্গে নাকি জ্যোছনার বিয়ের কথা হ'চ্ছে?"

গঙ্গাধরবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "হ্যাঁ, প্রায় ঠিক হ'য়ে এসেছে। এখন যে রকম বিয়ের বাজার, তাতে হাজার দেড় হাজার খরচ না করলে এমন পাত্র মেলা ভার—তা জ্যোছনা আমাদের দেখতে শুনতে ভাল, তাই হৃষীবাবুকে ভুলিয়ে ভালিয়ে দুশ টাকায় রাজি করেছি, এখন ভালয় ভালয় সব ঠিকঠাক হ'য়ে গেলে হয়।"

সুকুমার কহিল, "না না মামাবাবু, এ বিয়ে কিছুতেই হ'তে পারে না। হাজার দুই খরচ করলে যে ভাল ছেলে পাওয়া যাবে।"

গঙ্গাধরবাবু তাহার মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "খুব লম্বা চওড়া কথা ত বললে, চার বছর ধরে খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করলাম, এখন সর্ব্বস্ব খুইয়ে তোমার বোনের বিয়ে দিই!"

সুকুমার কহিল, "আমি এমন কথা আপনাকে কেন বল্‌তে যাব মামাবাবু, আমি বল্‌ছিলাম, বাবার যে দু হাজার টাকার ইন্‌সিওর ছিল না, সেই টাকাটা—।"

গঙ্গাধরবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, "এখনকার ছেলেপুলেরা এমন নেমকহারামই বটে,—কোন্ মুখে এমন কথা বল্‌লি—আমি ত আর রাজারাজরা নই—দু' দশ হাজার টাকার বিষয়ও আমার নেই যে তোকে আমি এতদিন ধরে লেখা পড়া শিখুই—খেতে অবশ্যি তোদের দিতেই হ'ত। তারপর তোর স্কুলের মাইনে, কাপড়, জলখাবার, বই, এ সব কোথ্‌থেকে হ'ল! একালের ছেলেদের ধরণ-ধারণ আমি একটু জানি বলেই সে টাকার একটা হিসেব রেখেছি; দেখ্‌তে চাস্ এখনই দেখ্‌তে পাবি—মেবে কেটে জোর শ চারেক টাকা থাকৃতে পারে—এ টাকা নিয়ে যেখানে ইচ্ছে তোর বোনের বিয়ে দিতে পারিস্—একালে ভাল কারো কর্‌তে নেই।"

সুকুমার বড় আশা করিয়াছিল যে, দুই হাজার টাকা দিয়া বোনটিকে সৎপাত্রে বিবাহ দিবে, কিন্তু গঙ্গাধরবাবুর কথায় সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। দুবেলা দুটী খাওয়া ছাড়া জলখাবারের মুখ সে কোন দিন দেখে নাই। স্কুল-কলেজের বই বেশীর ভাগ সে এর তার কাছে ভিক্ষা করিয়া পড়িয়াছে, কাপড় বৎসরে ছয়খানির বেশী সে পায় নাই, তবুও তাহাদের দেড় হাজার টাকার উপর ব্যয় হইয়া গেল!

সুকুমার ইতিপূর্ব্বে তাহার দুই একজন কলেজের বন্ধুকে জ্যোৎস্নার জন্য একটী পাত্রের সন্ধান করিতে বলিয়াছে, তাহারা বিশেষ চেষ্টা করিবে বলিয়া আশ্বাসও দিয়াছে, তাই সুকুমার তাহার মাতুলকে বলিল, "যাই হ'ক, বুড়োর সঙ্গে মামাবাবু কিছুতেই বিয়ে হ'তে পারে না—আমি দুই একজনের হাতে পায়ে ধরে দেখি, যদি ঐ টাকায় কাউকে রাজি কর্‌তে পারি। কেউ কি দয়া কর্‌বে না ?"

গঙ্গাধরবাবু গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "তা ভাল, সংসারটা একবার বেয়ে-চেয়ে দেখ। তা হ'লে কালই ও বিয়ে ভেঙ্গে দেব ; কিন্তু একটা কথা বলে রাখি, তোমার বোন্‌টি যে রকম বড় হ'য়ে উঠেছে—শেষে আমাকেই পাঁচজনের কাছে কথা শুন্‌তে হ'বে, তাতে আমি রাজি নই। তখন কিন্তু তোমাকে পণ দেখ্‌তে হ'বে।"

[৫]

সেদিন ভাগলপুরে পণপ্রথার বিরুদ্ধে এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। নিশিবাবু সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ওজস্বিনী ভাষায় এই পণপ্রথার বিরুদ্ধে বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ অনেকেরই চক্ষু সজল করিয়া তুলিয়াছিলেন। সভাভঙ্গের পর সুকুমারের এক বন্ধু বলিল, "দেখ্ নিশিবাবুর ছেলে অমলকে ত জানিস্ সুকুমার ! নিশিবাবু তার জন্যে একটি ভাল পাত্রী খুঁজছেন, তোর বোনকে তিনিও দেখেছেন—পছন্দ না

হ'বার ত যো নেই, চল্ এইবার তাঁকে ধরে পড়া যাক্—তিনি ত আর এক পয়সাও চাইবেন না।" পথে যাইতে যাইতে সুকুমারের কেবলই মনে হইতে লাগিল, এইবার জ্যোৎস্নার একটা কিনারা হইয়া যাইবে।

নিশিবাবু বাহিরের ঘরে চেয়ারের উপর বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন। তাঁহার সম্মুখে দুইখানি চেয়ারে দুই জন ভদ্রলোক বসিয়া তাঁহার কথার সায় দিয়া যাইতেছিলেন। এমন সময় সুকুমার ও তাহার দুই বন্ধু সেখানে আসিয়া সসম্ভ্রমে নিশিবাবুকে প্রণাম করিল।

নিশিবাবু প্রতিনমস্কারস্বরূপ মাথাটি ঈষৎ নাড়িয়া কহিলেন, "তোমরা কি চাও?"

তখন তিন জনে মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিল। শেষে যতীন সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "আপনার কাছে একটু বিশেষ কাজে এসেছি—সুকুমারকে ত আপনি চেনেন?"

নিশিবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "চিনি বৈকি, আমাদের গঙ্গাধরবাবুর ভাগ্নে ত?"

যতীন ভরসা পাইয়া কহিল, "আজ্ঞে, সুকুমারের বোন জ্যোৎস্নাকেও আপনি দেখেছেন?"

নিশিবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাতে একবার যতীনকে দেখিয়া লইয়া বলিলেন, "হ্যাঁ দেখেছি, বেশ মেয়ে, তা তোমরা কি চাও?"

যতীন আশান্বিত হইয়া কহিল, "শুনলাম অমলবাবুর জন্যে

আপনি একটি ভাল পাত্রী খুজছেন, তা সুকুমারের বোনের সঙ্গে অমলবাবুর বিয়ে—”

নিশিবাবু বাধা দিয়া কহিলেন, “হ্যাঁ অমলের এবার বিয়ে দেব বলে ঠিক করেছি; তা তোমরা ত জান, অমল এবার অনারে বি, এ, পাশ করে এম, এ, ল, পড়বার জন্যে কলকাতায় যাচ্ছে।”

নিশিবাবুর সম্মুখে উপবিষ্ট ভদ্রলোকের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিলেন, “আপনারা দেখছি ঘটকালী করতে এসেছেন; নিশিবাবু টাকা কখনও চাইবেন না তা নিশ্চয় জানেন।”

যতীন কহিল, “আজ্ঞে তা আমরা জানি, সেই ভরসাতেই ত এসেছি।”

ভদ্রলোকটি কহিলেন, “তা বুঝতে পেরেছি,—আচ্ছা কন্যা-পক্ষের অবস্থা কেমন, হাজার পাঁচ ছয় টাকা ব্যয় করতে পারবেন?”

বন্ধুত্রয় স্তব্ধ হইয়া গেল! এখনও এক ঘণ্টা উত্তীর্ণ হয় নাই, নিশিবাবু যে পণপ্রথাকে নিন্দা করিয়া বড় এক বক্তৃতা দিয়া আসিলেন,—আর তাঁহারই সম্মুখে তাঁহার একজন বন্ধু টাকার কথা তুলিলেন, অথচ তিনি একটি প্রতিবাদও করিলেন না!

তাঁহাদের মৌন থাকিতে দেখিয়া নিশিবাবু মৃদু হাসিয়া কহিলেন, “তোমরা বুঝি সভার বক্তৃতা শুনে আমার কাছে এসেছ, পণপ্রথা যে দেশের সর্ব্বনাশ করছে একথা আমি এখনও বলছি; তবে আমাদের দেশের লোকেরও দোষ আছে, তারা নিজেদের

ওজন বুঝে চলে না। যার যেমন সঙ্গতি, তার তেমনই পাত্রের সন্ধান করা উচিত, তা হ'লে দেনা-পাওনার কোন হাঙ্গামা হয় না। তুমি সে অবস্থার লোক নও, অথচ, ধর কথার কথা, তোমার আশা, তুমি তোমার বোনটিকে বড় লোকের ঘরের লেখাপড়া শেখা পাত্রের সঙ্গে বিয়ে দাও, তা হ'লে পণপ্রথা ওঠে কি করে বল দিকি; তোমরাই আরও পণপ্রথাকে প্রশ্রয় দিয়ে তাকে বাড়িয়ে তুলচ্ছ, কেমন ঠিক কথা কিনা? একটু ভেবে দেখ, তা হ'লেই বুঝতে পারবে, তোমরাই এক হিসেবে দেশের সর্ব্বনাশ করছ। এই ধর, আমি এমন জায়গায় ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ করব, যেখানে টাকা আমি চাইতে যাব কেন; তারা আপনিই ছেলের গুণ ও বাড়ীর অবস্থা দেখে পাঁচহাজার কেন, হয় ত দশ হাজারই দেবে। তখন কি আমি গর্ব্ব করে বলতে পারব না, দেখ আমি আমার ছেলের বিয়েতে এক পয়সাও পণ নিলাম না। এ একটা কত বড় সত্যি কথা একটু ভেবে দেখলেই তা বুঝতে পারবে। এমনই ভাবে যে যার অবস্থা বুঝে যদি চলতে শেখে, তা হ'লে পণপ্রথা আপনিই উঠে যাবে।"

সুকুমার বড় আশা করিয়া এখানে আসিয়াছিল, তদপেক্ষা অধিক আঘাত খাইয়া ফিরিয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া সুরেন বলিল, "এই জন্যেই আমি এই সব সভাসমিতির বিরোধী; যত সব ভক্ত-বিটেল! তোরা

ত খুব সভা সভা করে নাচিস্, এখন নিশিবাবুর ব্যাপার দেখে বুঝলি, আমার কথা ঠিক কি না ?"

সুকুমার কোন কথা বলিল না, সে সময় তাহার কথা বলিবার অবস্থাও ছিল না।

যতীন বলিল, "তাই ত, আজ খুব শিক্ষা পাওয়া গেল।"

এমন সময় পান্নাবাবুর সহিত তাহাদের দেখা হইল। পান্নাবাবু ইন্সিওরের একজন পাকা দালাল। পান্নাবাবু বলিয়া উঠিলেন, "কি হে সুরেন, তোমার দাদার ইন্সিওরের কি করলে? কাল সকালে কিন্তু আমি তোমাদের ওখানে যাচ্ছি। কাল আর কিছুতে তোমার দাদাকে ছাড়ছি না।"

সুকুমারের সহিত পান্নাবাবুর পরিচয় ছিল। সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা পান্নাবাবু, আমার ইন্সিওর হয় না?"

পান্নাবাবু আগ্রহভরে কহিলেন, "কেন হ'বে না, খুব হয়, তুমি ত হে সাবালক হ'য়ে গেছ। বল ত একটা করে দি। তোমার এখন বয়স কম, প্রিমিয়াম খুব কমই লাগবে। কত টাকা করবে বল দিকি? তা শুনে কালই তোমায় ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাই।"

সুকুমার আবার প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা পান্নাবাবু, কেউ যদি ইন্সিওর করবার পর আত্মহত্যা করে তা হ'লে টাকা পাওয়া যায়?"

তাহার এই অদ্ভুত প্রশ্নে সুরেন ও যতীন অবাক্ হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিল।

পান্নাবাবু কহিলেন, "অনেক ইন্‌সিওর কোম্পানীই দেয় না, তবে আমি যে ইন্‌সিওর কোম্পানীর এজেণ্ট তারা দেয়, অবশ্য একটা প্রিমিয়াম দেওয়ার ছ-মাসের মধ্যে আত্মহত্যা কর্‌লে তারা টাকাটা দিতে একটু হাঙ্গামা করে, ছমাস পার হ'য়ে গেলে কোন কথাই নেই। আমার এ কোম্পানী খুব ভাল ; তা ও কথা কেন হে সুকুমার ?"

সুকুমার হাসিয়া উত্তর করিল, "হঠাৎ মনে হ'ল তাই জিজ্ঞেস কর্‌লাম ; ও একটা কথার কথা। আচ্ছা পান্নাবাবু, আমি মরলে টাকাটা কে পাবে ?"

পান্নাবাবু কহিলেন, "যাকে তুমি লিখে দিয়ে যাবে ; আর যদি কিছু লেখা না থাকে, তা হ'লে তোমার ছেলে হ'ক, স্ত্রী হ'ক বা যে-কেউ উত্তরাধিকারী থাক্‌বে সে পাবে। তা হ'লে এখন করে কর্‌বে বল ?"

সুকুমার কহিল, "কালই, আমি হাজার পাঁচেক টাকার ইন্‌সিওর কর্‌তে চাই, কত প্রিমিয়াম লাগ্‌বে বলুন দেখি ?"

পান্নাবাবু কহিলেন, "আমার পকেটে বই আছে, এখনি দেখে বল্‌ছি, তা তুমি কি কর্‌তে চাও, এনডাউমেণ্ট, না হোল লাইফ ? আমি ত বলি এন্‌ডাউমেণ্ট কর, সেই সব চেয়ে ভাল, তুমি কুড়ি বছরের একটা এন্‌ডাউমেণ্ট করে

ফেল—তোমার বয়স খুব কম তাতে সামান্য বেশীই প্রিমিয়ামই লাগ্‌বে।"

সুকুমার কহিল, "যাতে প্রিমিয়াম কম লাগে, আমি তাই কর্‌ব, আপনি অনুগ্রহ করে তাই দেখে দিন।"

পান্নাবাবু কহিলেন, "তা হ'লে হোল-লাইফই কর, কিন্তু এন্‌ডাউমেণ্টই ছিল ভাল।" এই বলিয়া পকেট হইতে একখানি ইন্‌সিওরের বই বাহির করিয়া দেখিতে দেখিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা তোমার এখন ঠিক বয়সটা কত হ'ল?"

সুকুমার কহিল, "এই আঠার বছর পাঁচ মাস হ'য়েছে।"

পান্নাবাবু পুস্তকের উপর চোখ রাখিয়া কহিলেন, "খুব কম প্রিমিয়ামই লাগ্‌বে। মাসিক আট টাকা আন্দাজ।"

সুকুমার উৎসাহভরে কহিল, "সেই বেশ, তা হ'লে পান্নাবাবু কালই যাতে আমার ডাক্তারী পরীক্ষা হ'য়ে যায় তাই করে দিন, আমি কাল সকালেই আপনার বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ব।"

পান্নাবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, কালই সব ঠিক করে দেব, ডাক্তারী পরীক্ষার মাসখানেকের মধ্যে তোমার পলিসি এসে যাবে।" তারপর তিনি সুরেনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "দেখ সুরেন, তা হ'লে তোমার দাদার ওখানে আর একদিন যাওয়া যাবে, আস্‌ছে রবিবার, তাই ব'ল।"

[৬]

মাস দেড়েক পরে সুকুমার একদিন চুপি চুপি নিশিবাবুর সহিত দেখা করিয়া কহিল, "আজ্ঞে আমি পাঁচ হাজার টাকাই দেব, আপনি অমলবাবুর সঙ্গে জ্যোছ্‌নার বিয়ে দেবেন ত ?"

নিশিবাবু একটু আশ্চর্য্য হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তা বেশ ত। আমি ত সেদিন তোমাকে সে কথা স্পষ্ট করেই বলে দিয়েছি ; তোমার বোনটিকে আমার খুব পছন্দ, টাকা যখন দেবে বল্‌ছ, তখন আমার আপত্তি নেই। গঙ্গাধরবাবুই ত টাকাটা দেবেন ?"

সুকুমার কহিল, "আজ্ঞে না, আমিই জোগাড়জাগড় করে টাকাটা দেব। আমার মামাকে দয়া করে এ কথা জানাবেন না। তিনি মোটেই টাকা খরচ কর্‌তে চান না। তবে একটু দয়া আমাকে করতে হ'বে, ছ'টা মাস সময় দিতে হ'বে।"

নিশিবাবু কহিলেন, "তা বেশ, বিয়ের জন্যে আমার এমন তাড়াতাড়িও নেই, ছমাস না হয় আট মাস পরেই হ'বে, তার জন্যে কি যায় আসে, এর মধ্যে আমি আর অন্য কোন জায়গায় সম্বন্ধ দেখ্‌ব না। পরে যদি তুমি জোগাড় করে না উঠ্‌তে পার, তখন যা হয় কর্‌ব।"

সুকুমার তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল।

সুকুমার দিন গণিতে লাগিল। একটা দিন কাটিয়া যায়, আর তাহার বুকের বোঝাও অনেকটা হাল্কা হইয়া যায়। এক একটা দিন তাহার নিকট এক একটা যুগ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এই ত তাহাদের স্নেহময় জনক-জননী হারাইয়া তাহারা দেখিতে দেখিতে পূর্ণ চারি বৎসর কাটাইয়া দিল, আর এই ছয় মাস যেন আসিতে চায় না ; এক এক সময় তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, কালই কেন ছ মাস আসিয়া পড়ে না! এমনই করিয়া দিন গণিতে গণিতে প্রায় তিন মাস কাটিয়া গেল।

তাহার জনকজননীর মৃত্যুর পর এ চারি বৎসর ভাগলপুরে সেরূপ ভীষণ প্লেগ হয় নাই। প্লেগের সময় এখানে সেখানে দুই এক জন মারা গিয়াছে, কিন্তু রোগ সংক্রামক হইয়া সারা সহরে ছড়াইয়া পড়ে নাই, কাহাকে বাড়ীঘর ফেলিয়া পলাইতে হয় নাই। কিন্তু এইবার যে ভাবে প্লেগ দেখা দিল, তাহাতে সকলের মনে আশঙ্কা হইল, এবার বুঝি সহরে আবার মহামারি আরম্ভ হয়। দেখিতে দেখিতে সকলের আশঙ্কা ক্রমে সত্যে পরিণত হইল। ঘরদোর ছাড়িয়া লোকেরা দূর পল্লীতে, বা মাঠের মাঝে বাসা লইতে লাগিল। গঙ্গাধরবাবুও একটা বাড়ী ঠিক করিয়া বাঙ্গালীটোলার বাড়ী ছাড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এমন সময় সুকুমার আসিয়া কহিল, "মামাবাবু বাড়ী ছেড়ে সবাই চলে গেলে চোর ডাকাতে সব যদি নিয়ে যায়—তাই আমি ঠিক করেছি, আপনারা সকলে যান, আমি বাড়ী আগ্‌লে থাকি।"

গঙ্গাধরবাবু মহাখুসী হইয়া কহিলেন, "তা হ'লে খুব ভাল হয় বাবা, জিনিষপত্তরগুলো রক্ষা পায়। বাড়ী খালী হ'য়ে গেলে আর কোন ভয়ও থাক্‌বে না, তা ছাড়া আমি এসে দুবেলা দেখেশুনে যাব, তোমার ভয় কর্‌বার কিছু নেই।"

সুকুমার হাসিয়া কহিল, "না মামাবাবু, ভয় কিসের। আপনারা দেরী কর্‌বেন না, শীগ্‌গির বেরিয়ে পড়ুন, আজ আমাদের পেছনের বস্তিতে দু'জন মরেছে, আর কজনের নাকি হ'য়েছে।"

গঙ্গাধরবাবু মহাব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সত্যি নাকি, তা হ'লে এখনই আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি।"

জ্যোৎস্না কোথা হইতে এ সংবাদ পাইয়া তাহার দাদার নিকট ছুটিয়া আসিয়া কহিল, "সে কি দাদা, তুমি নাকি একলা এ বাড়ীতে থাক্‌বে?"

সুকুমার হাসিয়া কহিল, "এর মধ্যে তোকে এ খবর কে দিলে? তুই ত এখন মামাবাবুদের সঙ্গে বেরিয়ে পড়, আমি যা হয় পরে ব্যবস্থা কর্‌ব'খন।"

জ্যোৎস্না ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সে হ'বে না দাদা, তোমাকেও আমাদের সঙ্গে যেতে হ'বে।"

সুকুমার হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা কি হয় রে, বাড়ী ঘর দেখ্‌বে কে, চোর ডাকাতে যে সব লুটে নিয়ে যাবে।"

জ্যোৎস্না কহিল, "যে হ'ক বাড়ী দেখ্‌বে'খন, তুমি আমাদের সঙ্গে চল।"

সুকুমার এবার একটু গম্ভীর হইয়া কহিল, "আমার যাওয়া হ'বে না জোছনা তুই যা।"

জ্যোৎস্না কহিল, "তা হ'লে আমিও যাব না দাদা, আমি তোমার কাছেই থাক্‌ব।"

এমন সময় কুমুদিনী চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "ওরে ও জোছনা গেলি কোথারে, গাড়ী এসে কখন থেকে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাপু আমি ডাক্‌তে পারিনে—তুই থাক্ পড়ে এখানে।"

সুকুমার ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "জোছনা, মামিমার যে ডেকে ডেকে গলা ভেঙ্গে গেল, শীগ্‌গির যা শীগ্‌গির যা, আর দেরী করিস্ নি।"

কুমুদিনী আবার বলিয়া উঠিল, "কি হ'ল ছাই, তুমি না হয় একবার তাকে ডেকে জিজ্ঞেস ক'র সে যাবে কি না যাবে, ফেলে গেলে এখনই কত লোকে কত কথা বল্‌বে, না হ'লে আমার এমন কি দায় পড়েছে।"

সুকুমার কাতরকণ্ঠে কহিল, "লক্ষ্মী বোন্‌টি আমার কথা শোন্, যা, তুই যা।" কিন্তু জ্যোৎস্না গোঁ ধরিল, তাহার দাদা না গেলে সে কিছুতেই যাইবে না। তখন সুকুমার রাগ করিয়া কহিল, "ফের এক গুঁয়েমি,—তুই ভারি জ্যাঠা হ'য়ে গেছিস্, আমি পাঁচ-বার বল্‌ছি তবু কথা শোনা হ'চ্ছে না। যা এখনই গিয়ে গাড়ীতে ওঠ্‌গে, তোর কোন কথা আমি শুন্‌ব না।"

জ্যোৎস্না বিস্ফারিত নয়নে তাহার দাদার মুখের পানে চাহিয়া

রহিল। তাহার জীবনে এই আজ প্রথম সে তাহার দাদার নিকট তিরস্কৃত হইল। পূর্ব্বে সে অনেক অন্যায় কাজ করিয়াছে, কিন্তু একদিনের জন্যও সে তাহার দাদার নিকট কটু কথা শোনে নাই। আজ হঠাৎ তাহার সেই দাদা কেন যে তাহাকে কটু কথা বলিল, তাহা সে কিছুতেই ধারণা করিতে পারিল না। এমন সময় গঙ্গাধরবাবু সেখানে আসিয়া রুক্ষস্বরে কহিলেন, "জোছনা, তোর ব্যাপারখানা কি বল্ দিকি, যাবি কি না যাবি সোজা এক কথা বলে দে ?"

জ্যোৎস্না কাঁদকাঁদ হইয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি মামাবাবু দাদাকে ফেলে যেও না, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে চল ; ও মামাবাবু, তোমার দুখানি পায়ে পড়ি মামাবাবু।"

সুকুমার ধম্‌কাইয়া উঠিল, "ফের জ্যাঠামি।"

গঙ্গাধরবাবু অমনই বলিয়া উঠিলেন, "তাই ত, জ্যাঠামিই ত। উনি এয়েছেন ওঁর দাদার ওপর কর্ত্তাত্বি করতে, আচ্ছা জ্যাঠা মেয়ে যা'হক, নে, আর কাঁদতে হ'বে না, চল।" এই বলিয়া তিনি জ্যোৎস্নার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেলেন। জ্যোৎস্না কাঁদিতে কাঁদিতে গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সুকুমার গাড়ীর পাশে দাঁড়াইয়া কহিল, "জোছনা, কাঁদিস্ নি, আমি তোকে রোজ দুবেলা দেখে আস্‌ব।" জ্যোৎস্না কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া আরও ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল। সুকুমার গাড়ীর দিকে চাহিয়া স্তব্ধ হইয়া খানিকক্ষণ সেইখানে

দাঁড়াইয়া রহিল। তারপর গাড়ীখানি দৃষ্টির বাহির হইয়া গেলে, সে এক পা এক পা করিয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং সেই জনহীন নিস্তব্ধ কক্ষের মেঝের উপর পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'জ্যোছনা জ্যোছনা!'

দেখিতে দেখিতে তিন দিন কাটিয়া গেল। সুকুমার প্রতিদিন সকালে বিকালে একবার করিয়া জ্যোৎস্নাকে দেখিতে যাইত, কিন্তু কথা কহিবার অবকাশ পাইত না। সুকুমার দেখিত, জ্যোৎস্না মুখখানি কালি করিয়া দুইটী জলভরা চোখ তাহার দিকে ন্যস্ত করিয়া উন্মুক্ত জানালার পাশে দাঁড়াইয়া আছে।

[৭]

এ তিন দিন সুকুমারের বাটীর চারি দিক্ বেড়িয়া কেবল মর্ম্ম-ভেদি ক্রন্দনের রোল উত্থিত হইয়াছে; আর সেই হৃদয়বিদারকধ্বনি, 'রামনাম সত্য হায়', 'বল হরি, হরি বোল', চারিদিকের আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া তুলিয়াছে। গভীর রাত্রে নির্জ্জন কক্ষমধ্যে সুকুমার এক একবার সেই ডাকে চমকিয়া উঠিত। বসিয়া বসিয়া শুনিত, সন্তানহারা জননী 'বাপ বাপ' বলিয়া বুক চাপ্ড়াইতেছে—পতিহারা স্ত্রী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিতেছে। শুনিতে শুনিতে দেহ তাহার কণ্টকিত হইয়া উঠিত। ক্রমে ক্রমে সে রবও কমিয়া আসিল। কে আর কাহার জন্য কাঁদিবে! সকলেই যে সেই অজানা দেশের দিকে পা বাড়াইয়াছে!

চতুর্থ দিনে ঘুম হইতে উঠিয়া সুকুমার দেখিল, রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা পীড়িতনারায়ণের সেবার জন্য ঔষধ পত্র লইয়া সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন। সুকুমারের বাটির পাশের বাড়ীতে তাঁহারা আড্ডা লইয়াছেন। সুকুমারও তাঁহাদের সহিত মিশিয়া গেল। প্লেগ-রোগীর ঘরে ঘরে গিয়া মহানন্দে সেবা আরম্ভ করিয়া দিল।

আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। জ্ঞানানন্দ স্বামী সুকুমারকে কহিলেন, "ওহে বাবাজি, তুমি ত কাজ ভাল করছ না। যতদূর পার সাবধান হ'য়ে রোগীর কাছে যাবে, না হ'লে হয় ত তোমারও রোগ হ'তে পারে—দেখ্‌ছ কি রকম ব্যাপারখানা।"

সুকুমার মনে মনে হাসিয়া কহিল, তোমরা রোগ ভয় কর, তাই অত সাবধান—আমি ভয়ও করি না, আমার সাবধান হইবারও আবশ্যক করে না। তার পর প্রকাশ্যে কহিল, "আমার জন্যে ভাব্‌বেন না, আমার কিছুই হ'বে না।"

জ্ঞানানন্দ কহিলেন, "না বাবাজি, অতটা বাহাদুরী ভাল না।"

আরও তিন দিন কাটিল। প্লেগের আক্রমণ ও সংহার দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু রোগীর প্রাণপণ শুশ্রূষা করিয়া সুকুমার প্রতিদিন সুস্থদেহে বিষণ্ণমনে ফিরিয়া আসিতে লাগিল।

সেদিন সুকুমার একটী রোগীর জন্য দুধ জ্বাল দিতেছিল; এমন সময় রন্নাঘরের চাল হইতে একটা মরা ইঁদুর ঝপ্‌ করিয়া মেঝের উপর আসিয়া পড়িল। ইঁদুরটা বোধ হয় মরিয়া অনেকদিন ঐ

চালের উপর আটকাইয়া ছিল, তাই পতনমাত্র সারা ঘর বিকট দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। পাশে একখানি কাঠ পড়িয়াছিল। কি জানি কেন সুকুমার তাই দিয়া সেই গলিত ইঁদুরটিকে নাড়িয়াচাড়িয়া দেখিতে লাগিল। নাড়া পাইয়া কতকগুলি পোকা মেঝের উপর পড়িয়া কিল্‌বিল্‌ করিয়া উঠিল।

এমন সময় জ্ঞানানন্দ স্বামী আসিয়া কহিলেন, "ওহে ও কি কচ্ছ সুকুমার, এই সময় পচা ইঁদুর নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে আছে, ছি, ছি।"

সুকুমার একটু হাসিয়া কহিল, "দুধ হ'য়ে গেছে, আপনি নিয়ে যান—আমি একটু পরেই যাচ্ছি।"

পর দিন সুকুমার সেবা-কার্য্যে যোগ দিল না। বহু রোগী লইয়া সন্ন্যাসীরাও এমনই ব্যস্ত হইয়া রহিলেন, যে তাঁহারা কেহই সুকুমারের সন্ধান লইবার অবকাশ পাইলেন না। সন্ধ্যার পর জ্ঞানানন্দ স্বামী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ সারাদিন সুকুমারকে দেখ্‌তে পেলাম না যে, তার কি হ'ল বল দিকি? ছোকরা যে রকম বাড়াবাড়ি কর্‌ছিল—আমার ভয় হ'চ্ছে সে হয়ত অসুখেই পড়েছে। চল একবার তার খোজ নিয়ে আসি।"

সুকুমারের বাটী পৌঁছিয়া তাহার কোন সাড়া না পাইয়া এ-ঘর সে-ঘর ঘুরিয়া তাঁহারা সভয়ে দেখিলেন, সুকুমার একটা ঘরের মেঝেয় পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছে। জ্ঞানানন্দ স্বামী নিকটে গিয়া ডাকিলেন, "সুকুমার, সুকুমার।" কোন সাড়া নাই। তিনি দেহ

স্পর্শ করিয়া দেখিলেন, দেহ যেন একেবারে পুড়িয়া যাইতেছে। তাঁহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না, প্লেগ পূর্ণমাত্রায় সুকুমারের দেহ অধিকার করিয়াছে। তখনই ঔষধপত্র আনিবার জন্য তাঁহার সঙ্গীকে প্রেরণ করিলেন। ঘরের কোণে সুকুমারের শয্যা বিছান ছিল, তিনি তাহাকে ধরিয়া তাহার উপর শোয়াইয়া দিলেন। দেখিলেন, কি একখানা কাগজ তাহার বুকের জামার সহিত আঁটা রহিয়াছে। তিনি পাখা লইয়া হাওয়া করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ হাওয়া করিবার এবং জলপটি দিবার পর সুকুমার চোখ মেলিল। জ্ঞানানন্দ ডাকিলেন, "সুকুমার!"

সুকুমার তাঁহার দিকে চাহিয়া ক্ষীণকণ্ঠে কহিল, "আপনি এখানে কেন, আপনি যান।"

ইতিমধ্যে ঔষধ আসিয়া পৌঁছিল। স্বামীজীর সঙ্গী এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া সুকুমারের মুখের নিকট লইতেই সে ঔষধপূর্ণ গ্লাসটি তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া দূরে ফেলিয়া দিল। জ্ঞানানন্দ ভাবিলেন, বুঝি তাহার বিকার উপস্থিত হইয়াছে। আবার এক দাগ ঔষধ সুকুমারের মুখের নিকট ধরিতেই এবারও সে তাহা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। তাহার পর দাঁতে দাঁত দিয়া সে পড়িয়া রহিল। সারা রাত্রের মধ্যে তাহার সেই দাঁত ছাড়াইয়া এক বিন্দু জল অবধি কেহ তাহাকে খাওয়াইতে পারিল না।

ভোরের পাখী ডাকিয়া থামিয়া গেল, সূর্য্যকিরণ অরুণকিরণকে নিস্তেজ করিয়া ফেলিল। তখন জ্ঞানানন্দ স্বামী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ

করিয়া সুকুমারের কক্ষ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহার হাতে সুকুমারের সেই বক্ষসংলগ্ন কাগজখানি। তিনি দিনের আলোয় কাগজখানি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিয়া বুঝিলেন, সেখানি পাঁচ হাজার টাকার ইন্সিওর পলিসি। অপর পৃষ্ঠে দেখিলেন, পরিষ্কার হস্তাক্ষরে লেখা রহিয়াছে—"নিশিবাবুর পুত্র অমলবাবু আমার আদরের ভগিনী জোছনাকে বিবাহ করিলে, যৌতুকস্বরূপ এই পাঁচ হাজার টাকা পাইবেন।" স্বামীজী ঊর্দ্ধদিকে একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। এমন সময় জ্যোৎস্না কোথা হইতে সুকুমারের পীড়ার সংবাদ পাইয়া সেখানে ছুটিয়া আসিয়া সেই কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছিল, স্বামীজী দুই হাত বাড়াইয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "কোথায় যাচ্ছিস্ মা!"

জ্যোৎস্না কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "দাদা, আমার দাদা!"

সন্ন্যাসীরও চোখের পাতা ভিজিয়া উঠিল। তিনি গাঢ়স্বরে কহিলেন, "চুপ কর মা, চুপ কর।"

পুত্রবধূ

[১]

সুষমা বড়লোকের কন্যা। তাহার জনকজননী ইচ্ছা করিলে তাহাকে কোন এক ধনীর পুত্রের সহিত বিবাহ দিতে পারিতেন, কিন্তু তাঁহাদের সে ইচ্ছা ছিল না। তাঁহাদের উভয়েরই সঙ্কল্প ছিল, কোন একটি গৌরকান্ত গৃহস্থ যুবককে গৃহজামাতৃরূপে অধিষ্ঠিত করিবেন। তাই ঘটক যে দিন, বিমাতার প্ররোচনায় পিতা কর্ত্তৃক বিতাড়িত কিরণচন্দ্রকে লইয়া সুষমার পিতার নিকট উপস্থিত হইল, তখনই তিনি সানন্দে সেই সুন্দর যুবকটিকে গৃহ জামাতা করিয়া লইলেন। সে আজ আট বৎসরের কথা।

আজ তিন দিন হইল, কিরণের পিতা,—সুষমার শ্বশুর, বৃদ্ধ হরনাথ দেশ হইতে মরিয়া-বাঁচিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া তাঁহার কলি-

কাতার অর্দ্ধভগ্ন, জীর্ণ ইট্‌কোটায় আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দুর্দ্দান্ত দামোদর বৃদ্ধের যাহা-কিছু ছিল, সমস্তই গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে; বৃদ্ধের স্ত্রী, কিরণের সেই বিমাতা,—বৃদ্ধের কন্যা ও সেই কন্যার পুতুলের মত ছ বছরের ছেলেটি, বৃদ্ধের বড় আদরের নাতিটি,—কাহাকেও রাখিয়া যায় নাই।

যে দিন হরনাথ ক্ষতবিক্ষত অন্তরে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন, সে দিন সন্ধ্যার সময় কে একজন আসিয়া কিরণচন্দ্রকে এই সংবাদ দিয়া গেল। সেই যে কিরণচন্দ্র বাহির হইয়াছিল, তাহার পর দুই দিন আর শ্বশুরগৃহে ফিরে নাই। অবশ্য এইরূপ অনুপস্থিতি তাহার পক্ষে কিছু নূতন নহে। এমনতর প্রায় মাঝে মাঝে ঘটিত। প্রথমে অন্তরের নিভৃততম প্রদেশে বিষম ব্যথা অনুভব করিলেও, ক্রমে ক্রমে সুষমার ইহা সহ্য হইয়া গিয়াছিল।

অন্যদিনের অপেক্ষা, সে দিন সুষমা তাহার স্বামীর প্রত্যাবর্ত্তনের প্রতীক্ষায় অধিকতর ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার একটু বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল। তৃতীয় দিনেও যখন কিরণচন্দ্র বাটী ফিরিল না, তখন সুষমা ব্যস্ত হইয়া সর্ব্বাগ্রে গিয়া তাহার দাদাকে ধরিয়া পড়িল, "দাদা, আমাকে শশুরবাড়ী রেখে আস্‌বে?" দাদা অবাক্ হইয়া কহিল, "তোর শশুর-বাড়ী! সে আবার কোথায়?" সুষমা ঠিকানা জানাইয়া কহিল, "শুনেছ ত আমার শ্বশুরের কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে—তাঁকে যত্ন করে, এমন একজন কেউ নেই, তুমি যদি দাদা একবার আমায় সেইখানে পৌঁছে দিয়ে এস।"

দাদা হাসিয়া কহিল, “তুই পাগল হয়েছিস নাকি,—শ্বশুরবাড়ী যাওয়া-টাওয়া হ’তে পারে না।” তাহার পর সুষমা ভয়ে ভয়ে পিতাকে গিয়া এ কথা জানাইলে, তিনি ঘৃণাভরে হাসিয়া কন্যাকে বুঝাইয়া দিলেন, ‘তাও কি হয়।’ শেষে নিরাশ হইয়া সুষমা জননীর নিকট কাঁদিয়া পড়িলে, জননী অবাক্ হইয়া কহিলেন, “তোর হ’য়েছে কি? তুই কি ক’রে এমন কথা বল্লি? কিরণ অবধি বাপের সঙ্গে সম্বন্ধ একেবারে উঠিয়ে দিয়েছে, আর তুই কিনা সেখানে যেতে চাস্। তোর ভালর জন্যেই বল্‌ছি, ও কথা আর মনেও ঠাঁই দিস্‌নি।” সুষমা কিছু বলিল না, শুধু অঞ্চলপ্রান্তে চোখ ঢাকিয়া জননীর সম্মুখ হইতে উঠিয়া আসিয়া নিজের ঘরে মেজের উপর গিয়া লুটাইয়া পড়িল। খানিক পরে তাহার ছয় বৎসরের পুত্র বীরু আসিয়া ডাকিল, ‘মা, মা।’ সুষমা তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া তাহাকে কোলের মধ্যে টানিয়া লইয়া চুমু খাইয়া তাহার মাথাটি সযত্নে বুকের উপর রাখিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

এমন সময় অদূরে সিঁড়িতে কাহার পদশব্দ শোনা গেল। বীরু ধড়মড় করিয়া মাতার কোল হইতে উঠিয়া পড়িল এবং ‘বাবা আস্‌ছে’ বলিয়া বীরু ছুটিয়া বাহির হইয়া গিয়া আবার তেমনি করিয়া ছুটিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাকে জানাইয়া গেল, ‘মা, বাবা—এসেছে, বাবা এসেছে।’ শিশুর সমস্ত মুখখানি ছাপাইয়া আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল। সুষমা গলায় অঞ্চল

টানিয়া মেঝেতে মাথা ঠেকাইয়া মা কালীকে উদ্দেশ করিয়া প্রণাম করিল। সে যে বড় ব্যাকুল হইয়া মাকে ডাকিয়াছিল!

বীরু কিরণের হাত ধরিয়া এক রকম টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিল। শ্রাবণের শেষ। সেদিনকার মেঘমুক্ত প্রাতঃসূর্য্যের প্রখর রৌদ্রে কিরণচন্দ্রের সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার গাত্রের পাঞ্জাবিটি যেন বর্ষাবারিতে সিক্ত হইয়া গিয়াছে। কপালের উপর ঘর্ম্মবিন্দুগুলি তাহার স্বভাবসুন্দর মুখখানির শোভা আরও বাড়াইয়া তুলিয়াছে। কিরণচন্দ্র আসিয়া অলসভাবে খাটের একধারে বসিয়া পড়িল। তাহার দুই জানুর মধ্যস্থল অধিকার করিয়া বীরু দাঁড়াইয়া রহিল। সুষমা তাড়াতাড়ি পাখা লইয়া কিরণচন্দ্রকে বাতাস করিতে লাগিল।

খানিক পরে সুষমা কহিল, "ঘাম শুকিয়ে গেছে, এইবার জামাটা খুলে ফেল।" কিরণ জামাটি খুলিয়া ফেলিবামাত্র তাহার হাত হইতে জামাটি লইয়া আল্‌নায় টাঙ্গাইয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া সুষমা আবার বাতাস করিতে সুরু করিল।

এদিকে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া বীরু কিরণের অলস দেহকে একটু জাগ্রত করিয়া তুলিল। প্রশ্নগুলির মধ্যে অনেকগুলির কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। এমন সময় নীচ হইতে বীরুর ডাক পড়িল, সে অমনই ছুটিয়া ঘরের বাহির হইয়া গেল।

হাওয়া করিতে করিতে কিরণের মুখের উপর দুইটি উৎসুক নয়ন স্থাপন করিয়া সুষমা জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা কেমন আছেন?"

"তা আমি কি করে বল্‌ব। আমি তাঁর ওখানে যেয়ে উঠ্‌তে পারিনি।"

সুষমা ব্যগ্র হইয়া বলিয়া উঠিল, "সে কি, তাঁকে একবার দেখ্‌তেও যাওনি! তুমি না দেখ্‌লে, তাঁকে দেখ্‌বে কে? তাঁর আর কে আছে? এখনও সেই পুরণো কথা মনে ক'রে আছ না কি?"

কিরণ একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, "যতদিন বেঁচে থাক্‌ব সে কথা কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ব না। মিথ্যে কথায় বিশ্বাস ক'রে আমাকে কিনা বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। তখন ভাবেননি তাঁরও একদিন অসময় আস্‌তে পারে।"

সুষমা স্তব্ধ হইয়া রহিল, কিছু বলিতে পারিল না। তার পর নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে কহিল, "এখন যে তাঁর আর কেউ নেই, তুমিই যে তাঁর সব, তোমাকে কাছে পেলে তিনি এ শোকের মধ্যেও যে একটু সান্ত্বনা পেতে পারেন।"

কিরণ অন্যমনস্ক ভাবে কহিল, "তা আমি কি করব।"

সুষমা যেন কি বলিতে গিয়া থামিয়া গেল। কিরণের এ অবহেলা, এ তাচ্ছিল্য তাহার হৃদয়ে গিয়া দারুণ বিঁধিল। পিতা যদি একটা ভুলই করিয়া থাকেন—এর চেয়ে মানুষের জীবনে আর কি অসময় আসিতে পারে—পুত্র কিনা সেই সামান্য অভিমানের বশে পিতার এই দুঃসময়েও হৃদয়ের প্রকৃতি-পেলব বৃত্তিগুলিকে দলিয়া পিষিয়া এমনি কঠিন কঠোর হইয়া উঠিয়াছে।

সুষমা অন্তরের বেদনা চাপিয়া ধীরে ধীরে কহিল, "আমি আজ একবার বাবাকে দেখ্‌তে যাব।"

কিরণ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "না না, সেখানে তুমি কি ক'রে যাবে।"

সুষমা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "আমার মন ভারি অস্থির হ'য়ে উঠেছে, আমি একবারটি দেখ্‌তে যাব।"

কিরণ কহিল, "সেই এঁদো-পড়া ঘরে গিয়ে তুমি দাঁড়াবে কোথা? সেখানে তোমার কিছুতেই যাওয়া হ'তে পারে না।"

সুষমা দাঁড়াইয়াছিল, মেঝেয় বসিয়া পড়িয়া দুই হাতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া কহিল, "ওগো, তোমার দুটি পায়ে পড়ি, আমাকে নিয়ে চল, আমি আর থাকৃতে পাচ্ছিনি।"

কিরণ হাত ধরিয়া সুষমাকে তুলিয়া একটু আর্দ্র হইয়া কহিল, "তুমি যেতে চাইলেই ত আর হ'বে না, তোমার বাপমাকে ত একবার জিজ্ঞেস করা চাই।"

সুষমা উৎফুল্ল হইয়া কহিল, তাঁদের আর কি জিজ্ঞেস কর্‌ব। আপিস যাওয়ার সময় সঙ্গে ক'রে রেখে যেও।"

অগত্যা কিরণ রাজি হইয়া বলিল, "আচ্ছা তা রেখে যাব, কিন্তু বলে রাখ্‌চি আন্‌তে আমি পার্‌ব না।" এ কথার অর্থ বুঝিতে সুষমার একটুও দেরী হইল না। তবুও হাসি মুখে সে কহিল, "আচ্ছা তোমাকে আন্‌তে হবে না। শুধু পৌঁছে দিলেই হবে।"

[২]

বীরুর হাত ধরিয়া স্পন্দিতবক্ষে কম্পিত-পদে সুষমা ধীরে ধীরে তাহার বাপের বাড়ীর দাসীর সহিত শ্বশুরগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বৃদ্ধ হরনাথ দুই হাঁটুর মধ্যে মুখ ঢাকিয়া ধূলি-ঢাকা মেঝের উপর নিস্পন্দভাবে বসিয়া আছেন। সেই ক্ষুদ্র অন্ধকার ঘরখানি হইতে কেমন এক রকম ভাপ্‌সা গন্ধ বাহির হইতেছে। ঘরের কোণে হাঁড়ি-কলসীর গায়ে এক পুরু ছাতা ধরিয়া রহিয়াছে। বহুদিন অব্যবহারে পড়িয়া থাকায় শয্যাদ্রব্যগুলি একেবারেই ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সুষমার চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিল। বীরু ভয় পাইয়া মার আরও নিকটে সরিয়া গিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। ঝি আঁচল টানিয়া নাক চাপিয়া ধরিয়া বিশেষ বিরক্তির ভাব দেখাইতে লাগিল।

তাহাদের প্রবেশের শব্দ শুনিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে মাথা তুলিয়া চাহিলেন। অবিরত ক্রন্দনে তাঁহার বার্দ্ধক্যের ক্ষীণদৃষ্টি আর ও ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। হরনাথের প্রথমে মনে হইল, যেন কতকগুলি কিসের ছায়া তাহার চোখের সামনে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! হরনাথ আর একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতেই, সুষমা অঞ্চলের প্রান্তভাগ গলায় বেষ্টন করিয়া দুই হাতে খুঁটটি ধরিয়া সেই ধূলি-বহুল মেঝের উপর জানু পাতিয়া বসিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া

বৃদ্ধের দুই পায়ের ধূলি মাথায় লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। মায়ের দেখাদেখি বীরুও তাড়াতাড়ি একটা গড় করিয়া ফেলিল। বৃদ্ধ 'হাঁ-না' কিছুই বলিতে পারিলেন না, শুভ আশীর্ব্বচন তাঁহার হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ মথিত করিয়া বাহির হইতে চাহিয়াও বাহির হইতে পারিল না। হরনাথ উদাসভাবে বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে তাহার পানে চাহিয়া রহিল। ঝি বলিয়া উঠিল, "চিন্‌তে পার্‌চ না, তোমার ব্যাটার বউ গা, ব্যাটার বউ, আর তোমার ব্যাটার ছেলে।" কিরণের স্ত্রী, বড়লোকের মেয়ে! বুঝি তাহার এ দুঃসময়ে সে উপহাস করিতে আসিয়াছে! হরনাথ রুক্ষ দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিল, কিন্তু সুষমার মুখখানি এমনই করুণ, এমনই দীন, পোষাক-পরিচ্ছদও এমনই আড়ম্বরহীন—পরণে একখানি অর্দ্ধ-মলিন মোটা কাপড়—হাতে মাত্র কয়গাছি আটপৌরে চুড়ি,—দেখিয়াই হরনাথের মনে হইল, যেন করুণা আপনি দীন মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, বৃদ্ধের হৃদয়ের কোমল বৃত্তিগুলি যাহা এতদিনে শুষ্ক হইয়া একেবারে ধূলি হইয়া উড়িয়া যাইতে বসিয়াছিল, নূতন জল পাইয়া সেগুলি আবার যেন একটু স্ফূর্ত্তি পাইয়া উঠিল। হরনাথ আর্দ্র কণ্ঠে ডাকিলেন, 'মা!'

সুষমা কাঁদিয়া ফেলিল, 'বাবা!'

বৃদ্ধও আর চোখের জল রোধ করিতে পারিলেন না। অশ্রুধারা-পাতে তাঁহার শীর্ণ গণ্ডদেশ ভাসিয়া গেল। তিনি চোখের জল মুছিতে মুছিতে "দাদা আয়" বলিয়া দুই শিথিল বাহু দ্বারা বেষ্টন

করিয়া বীরুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। হরনাথের মন আলোড়িত করিয়া তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইল। তাঁহার সেই কত আদরের কন্যার সেই শিশু পুত্রটি—সেই নাতিটি,—সেও ঠিক এমনটি হইয়া উঠিয়াছিল, এমনই করিয়া সেও তাঁহার গলা জড়াইয়া বুকের সঙ্গে মিশিয়া থাকিত। হায়, সে আজ কোথায়? মাত্র ছয়দিন পূর্ব্বে শেষ যখন বৃদ্ধ তাহাকে দেখিয়াছিলেন, তখন মৃত্যুর পাণ্ডুর ছায়ায় শিশুর সমস্ত কোমল মুখখানি ভরিয়া গিয়াছিল,—চিরনিদ্রিত মাতার আড়ষ্ট শক্ত বাহুর কঠিন বন্ধনের মধ্যে থাকিয়া সে যে তখন আকণ্ঠ জল পান করিয়া অনন্ত নিদ্রার কোলে চিরবিরাম লাভ করিয়াছে! আর ত সে ফিরিয়া আসিয়া গালভরা হাসি হাসিয়া তাঁহার কোলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে না! বৃদ্ধের ক্ষত-বিক্ষত যুগল পঞ্জর কাঁপাইয়া দীর্ঘ শ্বাস বহিয়া গেল। বীরুকে তিনি বুকের মধ্যে আরও শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন।

[৩]

সারাদিন খাটিয়া সুষমা সেই জীর্ণ ঘর দুইখানিতে লক্ষ্মীশ্রী ফিরাইয়া আনিল। বাহিরের রোয়াকটি ঝিকে দিয়া ধোয়াইয়া পোছাইয়া রাখিল। এখন দেখিলে আর সে বাড়ী বলিয়া চেনা যায় না।

বিকালবেলা বাহিরের রোয়াকে বসিয়া হরনাথ তামাক

খাইতেছিলেন, আর বীরুর সহিত নানা সুখ দুঃখের গল্প করিতেছিলেন।

বীরু কহিল, "দাদু, তুমি আপিস যাও না? বাবা কেমন আপিস যায়।"

হরনাথ অন্যমনস্কভাবে কহিল, "হ্যাঁ দাদু, তোর বাবা আবার আফিসে যায়?"

বীরু হাসিতে হাসিতে কহিল, "তুমি তা জাননা দাদু, বাবা যে আপিসেই থাকে!"

বৃদ্ধ হরনাথ আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপিসে থাকে! বাড়ী থাকে না?"

বীরু কহিল, "না দাদু, বাবা ত রোজ বাড়ী আসে না, এক এক দিন আসে।"

কিরণ তাহা হইলে সে বাড়ীতেও থাকে না! সে এতদূর অধঃপাতে গিয়াছে! কত কথাই বৃদ্ধের মনে উঠিতে লাগিল! এমন সময় ভিতরে সুষমার কণ্ঠস্বর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার চিন্তাস্রোত খানিকক্ষণের জন্য রুদ্ধ হইয়া রহিল।

সুষমা ঝিকে বলিতেছে, "দেখ্ ক্ষেন্তি, তুই বাড়ী যা, গিয়ে মাকে বলিস্, আমি এখন কিছুদিন এখানেই থাকব।"

ঝি অবাক হইয়া বলিল, "সে কি দিদিমণি, তুমি এ ভাঙ্গা এঁদো বাড়ীতে থাকবে! আমরা ত ছোটলোক, দাসী চাকর, আমাদেরই এর মধ্যে জ্বর এসে গেছে, আর তুমি এখানে থাকবে?"

ঝি আরও কি বলিতে যাইতেছিল, সুষমা ধমক দিয়া উঠিল, "তোর অত কথার দরকার কি, তোকে যা বল্লাম তুই তাই গিয়ে মাকে বল্‌গে।"

ক্ষান্ত মুখ ভার করিয়া কহিল, "তোমারই ভালর জন্যে বলেছিলাম দিদিমণি, আমার তা না হ'লে এত মাথা ব্যথা কি পড়েছিল," বলিয়া সে হন্‌হন্ করিয়া বাটীর বাহির হইয়া গেল।

হরনাথ হুঁকাটি দরজার পাশে রাখিয়া বীরুর হাত ধরিয়া ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। সুষমাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মা, তুমি কি সত্যি এখানে থাক্‌তে এসেছ?"

সুষমা মুখ নত করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হ্যাঁ বাবা।"

বৃদ্ধের মুখচোখে আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তবুও একথা যেন তিনি বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না, তাই কহিলেন, "গরীবের এ ভাঙ্গা ঘরে তোমার যে ভারি কষ্ট হ'বে মা।"

সুষমার কণ্ঠস্বর আর্দ্র হইয়া আসিল, সে কহিল, "না বাবা, আমি বেশ থাক্‌ব। কষ্ট কেন হ'তে যাবে।"

দুই ফোঁটা তপ্ত অশ্রু হরনাথের গণ্ডের উপর ঝরিয়া পড়িল, ভারিগলায় তিনি কহিলেন, "আর দাদুভাই, তার যে খুব কষ্ট হ'বে। হ্যাঁ দাদু, তুই বুড়োর ভাঙ্গা ঘরে থাকতে পার্‌বি ত?"

বীরু যেন এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াই ছিল, কহিল, "আমি সেখানে যাব না দাদু, আমি তোমার কাছে থাক্‌ব।"

হরনাথ হাসিয়া কহিলেন, "তুই ভাই ত ভারি নেমকহারাম।" তাঁহার অসহ্য দুঃখের মধ্যেও হরনাথ আজ যেন অনেকটা আরাম পাইলেন।

হরনাথের সামান্য আয়। দেশে যাহা-কিছু ছিল তাহা ত সমস্তই ভাসিয়া গিয়াছে। আয়ের মধ্যে এখন এই অর্দ্ধেক বাড়ীটির ভাড়া, মাত্র পনরটি টাকা। তাঁহার এই দারুণ দুঃসময়ের উপর সুষমা কি আবার একটী মস্ত গলগ্রহ হইয়া তাঁহার বিপদ আরও বাড়াইয়া তুলিবে! সুষমা চিন্তিত হইয়া পড়িল।

তাহার মনে পড়িয়া গেল, সে ত প্রতি মাসে তাহার পিতার নিকট হইতে পঁচিশটি করিয়া টাকা হাত খরচ পাইয়া থাকে। তাহাতেই ত তাহাদের বেশ চলিয়া যাইবে।

সুষমা অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃত হইল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। কর্ম্ম-ক্লান্ত কেরাণীর দল, কেহ, বা বাড়ীর রোয়াকে, কেহ বা তাঁহাদের অপ্রশস্ত ছোট ঘরটীর ভিতর বসিয়া নানা গল্পে তাহাদের সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তি দূর করিবার প্রয়াস পাইতেছিল। বন্যার গল্প শুনিবার জন্য পাড়ার পাঁচ জন একেবারে হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল, আজ হরনাথকে রোয়াকে বসিতে দেখিয়া তাহারা যেন হাঁপ্ ছাড়িয়া বাঁচিল। হরনাথকে ঘিরিয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া তাহাদের কৌতূহল নিবারণ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের এই গল্প শুনিবার আমোদ যে বৃদ্ধের হৃদয়কে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দিতেছিল তাহা

তাহারা একবারও ভাবিল না। কেহ বা কথায়, কেহ বা দীর্ঘশ্বাসে মাঝে মাঝে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে লাগিল।

ভিতরে বসিয়া সুষমা লোকের এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে মনে মনে অসহ্য বেদনা অনুভব করিতেছিল। এমন সময় তাহার বাপের বাড়ীর সেই ক্ষান্ত ঝি আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল; হাসিয়া একটু ভঙ্গী করিয়া কহিল, "হ'ল ত যা বলেছিলাম, তখন ত আমার কথা শুনলে না দিদিমণি, এখন চল।"

সুষমা এ কথার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না, জিজ্ঞাসা করিল, "তুই ও সব কি বলছিস্?"

ক্ষান্ত হাসিয়া কহিল, "তোমার কথা শুনে মা ত একেবারে রেগেই অস্থির। তাই দাদাবাবু এসেছেন তোমাকে নিয়ে যেতে।"

সুষমা ব্যগ্র হইয়া কহিল, "দাদা এসেছে, কই, কোথায়?"

দাসী অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া কহিল, "তিনি গাড়ীতে বসে আছেন, এই পচা জায়গায় তিনি আসবেন নাকি!"

সুষমা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "আমি ত মাকে বলে পাঠিয়েছি, আমি এখন যাব না, এখানে থাকব, দাদা আবার যে নিতে এসেছেন।"

ক্ষান্ত তেমনই হাসিয়া কহিল, "তুমি যাবে না বল্লেই ত হ'বে না দিদিমণি, বাবু তোমায় এখানে থাকতে দেবেন কেন! নাও গুছিয়ে-গাছিয়ে সব, দাদাবাবু তোমায় বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আবার কোথায় যাবে।"

ক্ষান্তর কথায় সুষমা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল, "যা দাদাকে গিয়ে বলগে আমি যাব না। খবরদার তুই আমায় ফের বিরক্ত করতে আসবিনি!"

"আচ্ছা আমি বলচি গিয়ে দাদাবাবুকে," এই বলিয়া রাগে গশ্ গশ্ করিতে করিতে ক্ষান্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

একটু পরে ক্ষান্তর সহিত সুষমার দাদা ঘরে ঢুকিয়াই রুক্ষ স্বরে বলিয়া উঠিল, "তোর হ'য়েছে কি? কি বলিচিস্ তুই ক্ষান্তকে?"

সুষমা যথাসম্ভব মনের ভাব গোপন করিয়া সহজ শান্ত স্বরে কহিল, "কিছু বলিনি ত দাদা, তুমি এসেছ, ভালই হ'য়েছে, মাকে গিয়ে বল, আমি দিনকতক এখানে থাক্‌ব।"

সুষমার দাদার মেজাজটা একটু বেশী রকমের কড়া। তাহার ভগিনীর এই উক্তি তাহার নিকট অত্যন্ত গর্হিত ও অপমানসূচক বলিয়া মনে হইল। সে একটু অধিক উষ্ণ হইয়া কহিল, "ও সব হ'বে না, তোকে এখনি যেতে হ'বে। তোর জন্যে কি আমাদের পাঁচজনের কাছে মুখ দেখান বন্ধ হয়ে যাবে?"

সুষমা তবুও নরম হইয়া কহিল, "আমি শ্বশুরবাড়ী থাকব, তাতে পাঁচজনের কি?"

তাহার দাদা গর্জ্জিয়া উঠিল, "শ্বশুরবাড়ী থাক্‌ব! ভারি শ্বশুরবাড়ী হ'য়েছে! এতদিন কার খেয়ে মানুষ হয়েছিলি। কোথাকার একটা পাঁড়াগেঁয়ে চাষা,—একটা ভাঙ্গা বাড়ী!

আমাদের মাথা কাটা যাবে, না হ'লে ভারি বয়ে গেছ্‌ল তোকে নিয়ে যেতে।"

অসহ্য হইলেও সুষমা সংযত হইয়া কহিল, "এখন সে কথা বল্‌লে হবে কেন দাদা, বিয়ের আগে সে কথা ভাবা উচিত ছিল। তুমি যাই কেন বলনা দাদা আমি এখন কিছুতেই যাবনা।"

দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া তাহার দাদা কহিল, "এত বড় কথা! বেশ, তাই থাক্ ; দেখ্‌ব কতদিন তেজ থাকে। আমি এই সোজা কথা বলে যাচ্ছি, এখানে না খেয়ে বাড়ী চাপা পড়ে ম'লেও তোর নাম মুখে আনব না। ছোট লোকের সঙ্গে বিয়ে দিলেই এমনি হ'য়ে থাকে। মর না খেয়ে।"

সুষমা খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে কি উত্তর দিবে, কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। অপমান ও ক্ষোভে সে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার শ্বশুরের অপরাধ, তিনি গরীব! গরীব বলিয়া কি তাঁহারই বাড়ীর উপর দাঁড়াইয়া এমনই করিয়া তাঁহাকে অপমান করিবে! আজ যদি তাহার স্বামী আসিয়া বৃদ্ধের পার্শ্বে দাঁড়াইতেন, তাহা হইলে এমনই করিয়া কি তাঁহাকে তাহার দাদা অপমান করিতে পারিত? তাহার শ্বশুর ও স্বামীর প্রতি এই অন্যায় গালিগালাজ, সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না, সে আত্মসংযম হারাইয়া বসিল। হয় ত যাহা তাহার বলা উচিত ছিল না তাহা সে বলিয়া ফেলিল, "তাই মরব দাদা, আমিও বলছি তোমায়, না খেয়ে এখানে মরে পড়ে থাকব, তবুও তোমাদের

বাড়ী যাওয়ার নামও মুখে আনব না। দাদা, গরীব হ'লেই ছোটলোক হয় না।"

সুষমার দাদা রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে ঝড়ের মত ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া সুষমা কাঁদিতে লাগিল।

[৪]

পনর দিনের ভিতর অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। সুষমা বাপের বাড়ী হইতে চলিয়া আসিবার দিন তিনেক পরে, কিরণ একবার শ্বশুরবাড়ী গিয়াছিল। সেখানে শালার নিকট কতকগুলি শক্ত কথা শুনিয়া সেখানে যাওয়া একেবারেই বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বৃদ্ধ পিতার সহিতও সে দেখা করে নাই, সুষমা ও বীরুরও কোন খোঁজ লয় নাই; পুত্র ও স্ত্রীর প্রতি যে একটু সামান্য স্নেহের টান তাহার ছিল, সেটুকু সে হৃদয় হইতে একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছে।

সুষমার দাদা চলিয়া যাইবার দিন তিনেক পরে তাহার জননী গোপনে কন্যার জন্য কিছু খাবার পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়ায় পুত্রের সহিত আশু বিচ্ছেদের সম্ভাবনা দেখিয়া সুষমার পিতামাতা বাধ্য হইয়া কন্যার খোঁজ লওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

সুষমা তাহার জমানো যে কয়েকটী টাকা সঙ্গে করিয়া আনিয়া-

ছিল, তাই দিয়া পনর দিন বেশ ভালই কাটিয়া গেল। রাঁধা-বাড়া, গৃহস্থালীর অন্য যাহা-কিছু কাজ, সবই সে একাই করিত। হরনাথ কোন্ জিনিসটি খাইতে ভালবাসেন তাহা সে খুঁটিয়া খুঁটিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া লইত। তিনি যেটা খাইতে ভালবাসিতেন, সুষমা সেটা পরিপাটী করিয়া তৈয়ারী করিয়া রাখিত, তা ছাড়া বৃদ্ধ বয়সের পক্ষে বিভিন্ন মুখরোচক জিনিস প্রস্তুত করিয়া প্রতিদিন বৃদ্ধের কাছে বসিয়া কত যত্ন করিয়া খাওয়াইত। পান তামাকটি এবং অন্য যাহা-কিছু যখনই আবশ্যক হইত, বৃদ্ধ হরনাথ তখনই তাহা হাতের গোড়ায় পাইতেন। যাহাতে হরনাথ কোন অভাবই বোধ করিতে না পারেন এ বিষয়ে সুষমা বিশেষ সতর্ক থাকিত। ছেলেটী পড়িয়া গিয়া খুব ব্যথা পাইলে মাতা যেমন তাড়াতাড়ি একটা রঙচঙে পুতুল এবং আরও কত-কি আনিয়া তাহার সামনে ধরিয়া নানা ছলে ব্যথা ভুলাইবার প্রয়াস পাইয়া থাকে, সুষমাও ঠিক তেমনই করিয়া বৃদ্ধের এ ব্যথায় সান্ত্বনা দিতে প্রয়াস পাইতে-ছিল, এবং কতকটা সক্ষমও হইয়াছিল। সুষমার আদর যত্ন ও বীরুর নিত্য সঙ্গ পাইয়া হরনাথ সত্যই এ কয়দিনে দুঃখের গুরুভার অনেকটা লঘু করিতে পারিয়াছিলেন।

সপ্তাহ পরে একদিন সন্ধ্যাকালে হরনাথ কাপিতে কাপিতে শয্যাগ্রহণ করিলেন। রাত্রে জ্বরটা খুব বেশী বাড়িয়া উঠিল, সুষমা অত্যন্ত ভয় পাইল। তখন পাড়ায় 'টাইফয়েড' প্রায়

ঘরে ঘরে হইতেছিল এবং দুই এক জন মরিতেও ছিল। ঐ তাহাদের ভাড়াটিয়াও আজ দশদিন হইতে শয্যাশায়ী হইয়া আছে। বাঁচিবে কি মরিবে তাহাও এখন ডাক্তাররা ঠিক বলিয়া উঠিতে পারে নাই।

আজ সুষমা নিজেকে বড় অসহায় মনে করিল। যদি জ্বর আরও বাড়িয়া পড়ে, অসুখ যদি খুব শক্ত হইয়া দাঁড়ায়, তখন সে কি করিবে! সারারাত্রি হরনাথের শিয়রের কাছে 'ঠায়' জাগিয়া বসিয়া থাকিয়া সে কেবলই ঐ কথা ভাবিতে লাগিল, কাহার কাছে যাইবে, কি করিবে; কেমন করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবে। সে যে তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া বাপের বাড়ীর সংশ্রব অবধি ত্যাগ করিয়াছে। তাহার শ্বশুর ও স্বামীকে তাহার দাদা আসিয়া অপমান করিয়া গিয়াছেন,—সেখানে আর সে কিছুতেই মাথা হেঁট করিয়া যাইতে পারিবে না। শ্বশুরের অসুখের কথাও সেখানে কিছুতেই জানাইতে পারে না। তাঁহারা বড়লোক, দুঃখীর অসুখের কথা শুনিয়া যে উপহাস করিবেন, ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। তার চেয়ে,—সে আর কিছু ভাবিতে পারিল না, 'যা হয় হ'ক।' তাহার স্বামী,—তাঁহাকে যদি সে এ খবরটা দিতে পারিত! এখনও কি তিনি রাগ করিয়া থাকিতে পারিবেন! কিন্তু কোথায়, কাহাকে দিয়া সে তাহাকে এ সংবাদ দিবে!

তখন গভীর রাত্রি। সমস্ত সহর সুষুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয়

লইয়াছে। কেবল মাঝে মাঝে দুই একটী শিশুর চীৎকার ক্রন্দন সেই বিরাট নিস্তব্ধতাকে একটু চকিত করিয়া তুলিতেছিল। ভয়ে সুষমার গা ছম্‌ছম্‌ করিতে লাগিল। দুশ্চিন্তার পর দুশ্চিন্তাগুলি বায়স্কোপের ছবির মত একের পর একটা করিয়া তাহার মনশ্চক্ষের সম্মুখ দিয়া দ্রুত চলিয়া যাইতে লাগিল। সুষমা উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রত্যূষের প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া রহিল।

প্রভাত হইল, কিন্তু হরনাথের জ্বর উপশম হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সুষমা তাঁহার কপালে হাত দিয়া দেখিল, বোধ হইল, জ্বরটা যেন আরও বাড়িয়াছে। বৃদ্ধ একেবারে বেঁহুস হইয়া পড়িয়া আছেন। পাশের বাড়ীর একটী বউয়ের সঙ্গে সুষমার বেশ ভাব হইয়াছিল। সে তাহার নিকট ছুটিয়া গিয়া কহিল, "ভাই শ্বশুরের ত খুব জ্বর, একেবারে বেহুঁস হ'য়ে পড়ে আছেন। আমার ত ভারি ভয় হ'য়েছে। কি করি বল ত?"

সেও ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তাই ত ভাই, তুমি একেবারে একা, তোমার বাপের বাড়ী খবর দিয়ে পাঠাও না? তাঁরা এসে দেখা-শুনো করুন। আর তোমার স্বামী,—তিনি কোথায় চাকরি করে বল্লে না? তাঁকেও খবর দাও। এসে পড়লে আর তোমার কোন ভাবনা থাকবে না।"

বাপের বাড়ীর সহিত তাহার কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, এবং স্বামীর সঙ্গেও তাহার কতটুকু সম্বন্ধ, এ কথাটা সুষমা তাহার এই

বন্ধুটির নিকট হইতে গোপন রাখিয়াছিল। এ কথা সে কি করিয়া বলিবে! তাই তাহার প্রশ্নগুলি চাপা দিয়া অন্য কথা পাড়িল, "সে ত অনেক দেরীর কথা, এখন ভাই তুমি যদি ডাক্তার ডাকবার একটা বন্দোবস্ত করিয়ে দাও।"

সে আগ্রহভরে কহিল, "তার আর কি, আমি ওঁকে গিয়ে বল্‌ছি, এখনি ডাক্তার ডেকে এনে দেবেন'খন।"

"হ্যাঁ ভাই, তাই কর, আমি চল্লাম, বাবা একলা পড়ে আছেন, যদি জল-টল কিছু চান।" বলিয়া সুষমা ত্রস্তপদে চলিয়া গেল। কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল, হরনাথ সত্য 'জল জল' করিতেছেন, আর বীরু মুখখানি এতটুকু করিয়া একটি ছোট গেলাসে জল লইয়া "দাদু জল নাও, দাদু জল নাও" বলিতেছে, কিন্তু কে জল খাইবে! .

ডাক্তার আসিলেন, রোগীকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিয়া গেলেন, "অসুখ খুব শক্তই হ'য়েছে, তবে ঠিক যে কি অসুখ তা আরও দুই এক দিন না গেলে বলা যাবে না, খুব সাবধানে রাখবেন।" ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যহ দুইবার করিয়া আসার আবশ্যকতা জানাইয়া ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলেন।

গত রাত্রে যে দুশ্চিন্তাগুলি সুষমার মনের মধ্যে কেবলই যাওয়া-আসা করিতেছিল, সত্যই কি সেগুলি কঠিন সত্যে পরিণত হইবে! সত্যই কি সে আশ্রয়হীনা হইয়া পথে দাঁড়াইবে! ভগবান কি মুখ তুলিয়া চাহিবেন না? সে যে বড় অনাথা;—বাপ, মা, ভাই, সবাই

তাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, স্বামীও তাহার কোন সংবাদ লন না! এক শ্বশুর যে তাহার একমাত্র আশ্রয়! এই কথাগুলি বার বার তাহার মনে উদয় হইয়া তাহার ব্যথিত পীড়িত অন্তরকে আরও গুরুভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতে লাগিল।

[৫]

সুষমার অক্লান্ত পরিশ্রম, ভগবানের উপর একান্ত আত্মনির্ভর তাঁহার নিকট আন্তরিক কাতর প্রার্থনা, বৃদ্ধ হরনাথকে এ যাত্রা মরণের হাত হইতে ফিরাইয়া আনিল। একচল্লিশ দিন পর বৃদ্ধের জ্বর ছাড়িল, আরও সপ্তাহ কাটিয়া গেলে তিনি পথ্য পাইলেন।

ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধ বীরুকে লইয়া আবার বাহিরের রোয়াকে গিয়া বসিয়া পাড়ার লোকের সহিত নানা গল্পে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্রবধূর প্রশংসা তখন পাড়াময় ছড়াইয়া গিয়াছে, যাহার সহিত বৃদ্ধের দেখা হইতেছে, সেই বৃদ্ধকে বলিতেছে, 'মশায় এমন বউ কারু হয় না। এ যাত্রা তারই যত্নে বেঁচে গেছেন, ব্যামোটি কি আপনার কম হ'য়েছিল।' শুনিয়া বৃদ্ধের চক্ষু জলে ভরিয়া আসিত।

সকাল বেলা তামাক টানিতে টানিতে হঠাৎ হরনাথের মনে পড়িয়া গেল, এত বড় ব্যারামের খরচপত্র ত কম নহে,—ডাক্তার ঔষধ পথ্য এ সব খরচ কোথা হইতে চলিল, তাহার পর এখনকার এই রকম আহার—সুষমা কি করিয়া চালাইতেছে! সে কি বাপের বাড়ী হইতে টাকা চাহিয়া আনিয়া এই সব খরচ পত্র

চালাইতেছে ? কিন্তু সুষমা যে বড় অভিমানিনী ! সে কি নীচু হইয়া শ্বশুরের জন্য তাহার বাপের কিকট যাচ্ঞা করিতে গিয়াছিল ?

হরনাথ কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিলেন না। তবে কি কিরণ আসিয়াছিল ? তিনি তামাক টানিতে টানিতে ভিতরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন, "মা" !

"বাবা ডাক্‌চেন ?" বলিয়া সুষমা ব্যস্ত হইয়া শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যখনই শ্বশুর তাঁহাকে স্নেহময় কণ্ঠে মা বলিয়া ডাকিতেন, তখনই সুষমার অন্তর গভীর আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। আবার যে সে এমন স্নেহের 'মা' ডাক শুনিতে পাইবে এই কদিন পূর্ব্বেও সে যে একথা ভাবিতেও পারে নাই। হরনাথ চাহিয়া দেখিলেন, তাহার বধূমাতার সোণার বরণ কালি হইয়া গিয়াছে, তাহার দেহটি ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু সেই ক্ষীণ মুখের জ্যোতিটুকু যেন আরও বেশী উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় হঠাৎ সুষমার মণিবন্ধের উপর চোখ পড়িতেই দেখিলেন, তাহার বউমার হাতের সেই সোণার চুড়ি কয়গাছি নাই। সেখানে কয়েকগাছি কাঁচের চুড়ি শোভা পাইতেছে। বৃদ্ধের আর কিছু বুঝিতে বাকি রহিল না। তাঁহার আর কিছু জিজ্ঞাসা করাও হইল না। আর একবার বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন, "মা !"

সুষমা মধুর কণ্ঠে উত্তর করিল, "কি বাবা ?"

"না, কিছু না" বলিয়া বৃদ্ধ আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন।

[৬]

সুষমার শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাহার সেই সদা হাস্যময় মুখের উপর চিন্তার যে কাল সূক্ষ্ম রেখাপাত হইয়াছে, সেইটাই হরনাথকে জানাইয়া দিল, তাঁহার বধূমাতার হাতের কড়ি ফুরাইয়া আসিয়াছে, একেবারে নিঃসম্বল হইবারও তাহার বড় বিলম্ব নাই। সেই দিন হইতে আর একটা নূতন ভাবনা তাঁহাকে বোঝার মত চাপিয়া ধরিল। টাকা—খরচের টাকা! তাঁহার ভাড়াটিয়া এখনও শয্যাশায়ী, পীড়িত। সামান্য চাকরির উপর তাহার নির্ভর, অসুখে পড়িয়া সে চাকরিটিও প্রায় যাইতে বসিয়াছে! সে এখন ভাড়া দিবে কোথা হইতে? হরনাথ কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। এ বয়সে চাকরিইবা তাঁহাকে কে দিবে! কোন ব্যবসায় করিলে হয় না? তাহাতেও ত কিছু টাকা চাই! তাহাই বা তিনি কোথায় পাইবেন! বাড়ীটি অনেক দিন বন্ধক পড়িয়াছে। তাঁহার গ্রামের একটী ভদ্রলোক তাহার সারা-জীবনের উপার্জ্জনের অর্থ তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। বন্যায় বাড়ীঘরের সঙ্গে টাকাকড়ি সমস্তই কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে! বৃদ্ধ বাটী বন্ধক দিয়া আজ সাত দিন হইল সেই গচ্ছিত অর্থ প্রত্যর্পণ করিয়াছেন। রোয়াকে বসিয়া বৃদ্ধ কেবলই এই কথা ভাবিতেছিলেন, টাকা কিছু ত চাই, না হইলে যে না খাইয়া মরিতে হইবে!

তিনি মরেন তাহাতে কোন দুঃখ নাই। কিন্তু তাঁহার দেবীকল্পা বধূমাতা, যে ঐশ্বর্য্য, সুখ, পিতামাতার অগাধ স্নেহ বিসর্জ্জন দিয়া এই হতভাগ্য বৃদ্ধের সেবার ভার গ্রহণ করিয়া প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা ছাড়িয়া এই ভগ্ন গৃহের কোণে আসিয়া স্বেচ্ছায় আশ্রয় লইয়াছে, সেই বধূমাতা ও তাহার এই সুখৈশ্বর্য্যে বর্দ্ধিত সুকুমার পুত্রটি না যে খাইয়া মরিবে! তাঁহার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল।

এমন সময় বাড়ীর সম্মুখ দিয়া একজন ফিরিওয়ালা হাঁকিয়া গেল, "চাই ফুলকোপি,—ভাল ফুলকোপি।" বৃদ্ধ চমকিয়া সেই দিকে চাহিলেন! 'ফিরি, ফিরি করিলে হয় না? লোকে নিন্দা করিবে? ফিরিওয়ালা বলিবে? তাহাতে কি আসে যায়! ব্যবসা, স্বাধীন ব্যবসা! ইহাতে অপমান কি? তাঁহার দেবীতুল্যা বধূমাতা সপুত্র না খাইয়া তাঁহারই চোখের সম্মুখে একটু একটু করিয়া মরিবে, আর তিনি মিথ্যা অপমানের ভয়ে ফিরি করিতে পারিবেন না? কেন পারিবেন না? খুব পারিবেন! রোজ বাজার হইতে কপি কিনিয়া আনিবেন, রাস্তায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেচিয়া আসিবেন। রোজ একটা টাকাও ত তিনি পাইবেন। তাহাতে তাঁহাদের তিন জনের চলিয়া যাইবে। মাত্র পাঁচটি টাকা হইলেই তাঁহার এ ব্যবসা বেশ চলিবে! পাঁচটি টাকা কি ধার মিলিবে না? এ সামান্য কটি টাকা তিনি সংগ্রহ করিতে পারিবেন না? টাকা রোজগারের একটা সহজ পন্থা

আবিষ্কার করিয়া হরনাথ সত্যই খুব উৎসাহিত ও উৎফুল্লিত হইয়া উঠিলেন।'

দুপুর বেলা কাঁদে চাদর ফেলিয়া হরনাথ রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলেন। এ বাজার সে বাজার ঘুরিয়া কপির দর জানিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

হরনাথের আর দেরী সহিতেছিল না। কি করিয়াই বা সহিবে! তিনি যে লুকাইয়া দেখিয়াছেন তাঁহার আহারের ব্যবস্থা ঠিক সমান রাখিয়া তাঁহার বধূমাতা যে আজ দুইদিন হইতে এক বেলা করিয়া খাইতে সুরু করিয়াছে, দিনের বেলা দুখানি বাতাসা মুখে দিয়া শুধু এক ঘটী জল খাইয়া কাটাইয়া দেয়, রাত্রে খায়, তাহা শুধু নুন আর শুকনো ভাত! আর দুদিন পরে বোধ হয় তাহাও বন্ধ হইয়া যাইবে!

সন্ধ্যার পূর্ব্বে হরনাথ ক্লান্ত হইয়া বাড়ী ফিরিলেন। হাত মুখ ধুইয়া হুঁকাটি লইয়া মুখুয্যে মহাশয়ের প্রতীক্ষা করিয়া রোয়াকে বসিয়া রহিলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মুখুয্যে মহাশয় এই রোয়াকে আসিয়া বসিয়া থাকেন, আজও আসিলেন। হরনাথ একেবারেই কথা পাড়িয়া বসিলেন, "মুখুয্যে মশায়, আমার একটা উপকার করতে হবে।"

মুখুয্যে মহাশয় সহাস্যে কহিলেন, "আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হ'তে পারে বলুন, আমার সাধ্যের বাইরে না হ'লে অবশ্য করব।"

হরনাথ উৎসাহিত হইয়া কহিলেন, "পাঁচটি টাকা আজ রাত্রেই আমায় ধার দিতে হ'বে। এ উপকারটি আপনার করতেই হবে মুখুয্যে মশায়। আমি আপনার সঙ্গে গিয়ে টাকা নিয়ে আস্‌ব।"

মুখুয্যে মহাশয় চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ মৌন হইয়া থাকিয়া কহিলেন, "পাঁচটি টাকা,—তা এমন কিছু না, তবে হ'চ্ছে কিনা, এখন ত আমার হাতে নেই, দু পাঁচ দিন দেরী হ'বে।"

দেরী! হরনাথের মাথায় যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল! দু পাঁচ দিন পরে তাহারা কোথায় থাকিবে! হরনাথ মুখুয্যে মহাশয়ের হাত জড়াইয়া ধরিয়া কহিলেন, "দোহাই আপনার, আজ আমাকে দয়া করে পাঁচটি টাকা দিন, না হ'লে আপনাকে সত্য বলচি, না খেতে পেয়ে মরতে হ'বে।"

"হা-হা-হা", মুখুয্যে মহাশয় হাসিয়া উঠিয়া কহিলেন, "এ আপনি কি বলছেন, হা-হা-হা, পাঁচটি টাকার জন্যে না খেতে পেয়ে মারা যাবেন! তবে হ'চ্ছে কি না, আমার হাতে টাকা থাক্‌লে কি আর আপনাকে বল্‌তে হ'ত, হা-হা-হা।"

ইহার পর আর হরনাথ কি বলিবেন। তাঁহার যে বড় আশা ছিল, মুখুয্যে মহাশয়ের নিকট চাহিলে অনায়াসেই পাঁচটি টাকা পাইবেন। হরনাথের শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতে লাগিল। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে অন্ধকার যেন বিকট মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সেই অন্ধকারের মধ্যে তিনি যেন স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, অনশন-ক্লিষ্ট পুত্রটিকে বক্ষে চাপিয়া তাঁহার বধূমাতা

আকাশের পানে স্থির-দৃষ্টি হইয়া ধূলির উপর পড়িয়া আছে। দুই মাস পূর্ব্বের ঠিক এমনই আর একটি দৃশ্যও তাঁহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল! হরনাথ চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "পাঁচটি টাকা!"

মুখুয্যে মহাশয় ইতিমধ্যে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছেন। রোয়াকে তখন আরও দুই এক জন আসিয়া বসিয়াছিল। "কি মশায় স্বপ্ন দেখছেন না কি?" বলিয়া একজন হরনাথকে একটু নাড়িয়া দিল, বৃদ্ধ চমকিয়া উঠিয়া চোখ চাহিলেন।

মুখুয্যে মহাশয়ের সহিত হরনাথের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সুষমা তাহা সমস্তই শুনিয়াছিল। সে অস্থির হইয়া উঠিল। তাহার হাতে যে মাত্র তিনটি টাকা আছে। পাঁচটি টাকার জন্য শ্বশুর এমনই ভাবে লাঞ্ছিত হইলেন! হাতের দিকে সে একবার চাহিয়া দেখিল। তখনও সেই কাচের চুড়ির মধ্যে একটি সোণার জিনিস ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। ইহা থাকিতেও শ্বশুর পাঁচটী টাকার জন্য এত কষ্ট পাইবেন। সুষমা বাঁচিয়া থাকিতে ইহা কিছুতেই হইতে দিবে না।

সে তাড়াতাড়ি খিড়কীর দরজা দিয়া পাশের বাড়ীর বউটী—তাহার সেই বন্ধুটির—বাড়ী চলিয়া গেল। বন্ধু তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া কহিলেন, "কি ভাই, রাত্তিরে যে?"

"আমার আর একটি গয়না বেচে দিতে হ'বে। তোমার শাশুড়ীকে একবার বল। এখনি আমার পাঁচটি টাকার ভারি দরকার।"

"আচ্ছা বলচি," বলিয়া সে চলিয়া গেল। খানিক পরে শ্বাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া ফিরিয়া আসিল।

তাহার শ্বাশুড়ী গম্ভীর হইয়া কহিলেন, "দেখি মা, কি গয়না ?"

সুষমা হাত বাড়াইয়া তাহার সেই সোণাবাঁধান 'নোয়া' গাছটি দেখাইয়া দিল। গৃহিণী বলিলেন, "ও যে 'নোয়া' স্বামীর আয়ুর জন্যে যে হাতে রাখতে হয়, ও কি ক'রে বেচ্‌বে।"

সুষমা চিন্তিত হইয়া কহিল, "মা ওর বদলে এমনি নোয়া পল্লে হ'বে না, আমার যে পাঁচটি টাকা এখনি চাই।"

তিনি বলিলেন, "তা বাছা হ'বেই না, এ কথাই বা কেমন করে বলি, নোয়া পরা হ'চ্ছে নিয়ম, সোণা দিয়ে বাঁধিয়ে পরা ও কেবল বাবুয়ানা বই ত নয়।"

তাঁহাদেরই ঝিকে দিয়া তখনই নোয়া কিনিয়া আনাইয়া কপালে ছোঁয়াইয়া, সুষমা মনে মনে কহিল, "হে মা কালি, তাঁকে চির-জীবি কর, আমার দোষ নিও না।" এবং সেই 'নোয়া'গাছটি পরিয়া সোণা-বাঁধান নোয়াগাছটি আস্তে আস্তে খুলিয়া আর একবার কপালে ঠেকাইয়া গৃহিণীর হাতে দিল। গৃহিণী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, অন্ততঃ দেড় ভরি সোণা আছে, খাঁটি গিনি সোণা—সোণার দরে বেচিতে গেলে ইহার দাম ত্রিশ টাকার কম হইবে না। গৃহিণী বলিলেন, "তা মা রাত্তিরে কোথায় এর দাম যাচাই করতে যাব। আর যাচাই বা কি করব। এতে ত একটুখানি সোণা

আছে, তা যা হ'ক মা, আমি ত আর তোমাকে ঠকাবো না; তা তুমি এখন পাঁচটি টাকা নিয়ে যাও, কাল সকালে এসে বাকি দশটি টাকা নিয়ে যেও।"

সুষমা প্রফুল্লচিত্তে কহিল, "আচ্ছা মা, তবে আমার পাঁচটী টাকা দিন।"

গৃহিণী বাক্স হইতে পাঁচটী টাকা আনিয়া সুষমার হাতে দিলেন।

"তবে ভাই এখন আসি", বলিয়া বন্ধুর নিকট বিদায় লইয়া সুষমা উৎফুল্ল হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। হরনাথ তখনও বাহিরের রোয়াকে বসিয়াছিলেন।

এমন সময় বীরু আসিয়া কহিল, "দাদু, ও দাদু, এই নাও পাঁচটী টাকা, মা তোমায় দিলে!" বলিয়া বীরু টাকা কয়টী বৃদ্ধের হাতে দিল। হরনাথের সমস্ত দেহ স্পন্দিত হইয়া উঠিল। কোন কথাই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না।

[৭]

পরদিন অতি প্রত্যূষে হরনাথ টাকা কয়টি লইয়া বাজারে বাহির হইয়া গেলেন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই মুটের মাথায় একটা নূতন ঝুড়িতে বোঝাই করিয়া অনেকগুলি ফুলকপি কিনিয়া লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। বীরু উঠিয়া তখন রোয়াকে বসিয়াছিল।

সে ছুটিয়া মাকে গিয়া কহিল, "মা, মা, দেখবে এস, দাদু কত কপি কিনে এনেছে।"

হরনাথ ততক্ষণে সেখানে আসিয়া মুটের মাথা হইতে কপিগুলি নামাইয়া ফেলিয়া মুটেকে দাম চুকাইয়া দিলেন। সুষমা কিছু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবা এত কপি কি হবে?"

হরনাথ তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া সহজ শান্তস্বরে কহিল, "বেচব মা।"

সুষমা অত্যন্ত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "বেচবেন! কাকে?"

হরনাথ কোনরূপ বিচলিত না হইয়া কহিলেন, "কেন, মাথায় ক'রে দোরে দোরে ঘুরে বেচব, না হ'লে মা তোমাদের খাওয়াব কি করে?"

এক নিমিষে সুষমার সমস্ত দেহের রক্ত যেন জল হইয়া গেল। কত দিনের পুরাতন রোগীর মত তাহার মুখখানি একেবারে সাদা হইয়া গেল! চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া তাহার বলিতে ইচ্ছা হইল, "ওগো কোথায় তুমি, একবার দেখে যাও, তোমার মত যাঁর ছেলে, তিনি কিনা আজ ভাতের জন্যে রাস্তায় ফিরিওয়ালা হ'তে চলেচেন!"

বেলা বাড়িয়া যায় দেখিয়া হরনাথ কপিগুলি ঝুড়িতে গুছা-ইয়া লইয়া গায়ের চাদরটি বিঁড়ের মত করিয়া মাথায় রাখিয়া ঝুড়িটা তাহার উপর বসাইয়া দিলেন।

বীরু এতক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, সে তখন বলিয়া উঠিল, "দাদু আমায় একটা ঝুড়ি কিনে দাও, আমি তোমার সঙ্গে

কপি বেচ্‌তে যাব।” হরনাথ তাড়াতাড়ি ঝুড়ি লইয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল। দেওয়ালে ঠেশ্‌ দিয়া পাষাণ মূর্ত্তির মত সুষমা দাঁড়াইয়া রহিল।

ওরে চরিত্রহীন নির্দ্দয় পুত্র, ওরে হৃদয়হীন ধনৈশ্বর্য্যমত্ত কুটুম্ব বন্ধু! একবার তোরা এ দৃশ্য দেখিয়া যা। কঠিন প্রস্তরের বুক চিরিয়াও ত জল বাহির হয়, তোদের মনুষ্যহৃদয় কি করুণায় এতটুকু অভিসিঞ্চিত হইয়া উঠিবে না। না উঠুক, তবু একবার চোখের দেখা দেখিয়া যা।

গলির ভিতর হরনাথ ভাল করিয়া চাহিতে পারিলেন না। এক রকম চক্ষু বুজিয়াই তিনি গলিটি পার হইয়া বড় রাস্তায় গিয়া পড়িলেন। চারিদিকে একবার তিনি চাহিয়া দেখিলেন। এই রাস্তা দিয়া তিনি কালও ত গিয়াছেন, কই তখন ত এমন বোধ হয় নাই; আজ যে সবই তাঁহার নিকট কেমন নূতন বলিয়া বোধ হইতে লাগিল,—সমস্ত জিনিষগুলির উপর কে যেন আজ কতখানি ছাই মাখাইয়া রাখিয়াছে; এমন সূর্য্যালোক, সেও যেন আজ তাঁহার নিকট মলিন নিষ্প্রভ ঠেকিতেছে; তাঁহার সমস্ত শরীরও যেন কেমন অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। তাঁহার পা যেন আর চলিতে চাহিতেছে না। তাঁহার চোখের সম্মুখে অমনই তাঁহার সেই অন্ধভক্ত বধূমাতার শীর্ণ মূর্ত্তিখানি ভাসিয়া উঠিল। তিনি আবার জোরে জোরে চলিতে লাগিলেন। এমন সময় তাঁহার পাশ দিয়া একজন হাঁকিয়া গেল, “চাই ফুল-কপি, ভাল ভাল ফুল-কপি।”

হরনাথের মনে হইল, "তাই ত, না হাঁকিলেই বা লোকে কি করিয়া জানিবে, আমি ফুল-কপিওয়ালা। আচ্ছা হাঁকি।" হরনাথ হাঁকিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাঁহার কণ্ঠ হইতে কোন স্বরই বাহির হইল না। তেমনই নীরবে তিনি কপির ঝুড়িটী মাথায় লইয়া পথ বাহিয়া চলিতে লাগিলেন। পাশ দিয়া আবার আর একজন ফুল-কপিওয়ালা হাঁকিয়া গেল। হরনাথ তখন মনের মধ্যে কেবল ঐ কথাই আবৃত্তি করিতে করিতে চলিয়াছিলেন। এবার বহু কষ্টে তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "চাই—চা-ই," বাকি 'ফুলকপি' কথাটি কিছুতেই তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সম্মুখে একটী গলির মোড় দেখিতে পাইয়া সেই গলির মধ্যে তিনি ঢুকিয়া পড়িয়া যেন একটু হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। তাঁহার সম্মুখেই আর একজন জোরে হাঁকিয়া উঠিল, "চাই ফুল-কপি।" হরনাথ এবার গলি কাঁপাইয়া আরও জোরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, "চাই ফুল-কপি।"

পাশের এক বাড়ী হইতে একটী রমণী মুখ বাড়াইয়া ডাকিল, "ফুলকপিয়লা, অ, ফুলকপিয়লা।" হরনাথ ধীরে ধীরে সেই বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, দুই তিনটি যুবতী এ ওর গায়ে পড়িয়া হাসিয়া রোয়াকের উপর গড়াইয়া পড়িতেছে। হরনাথকে দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিল, "কি গো কপিয়লা, কেমন কপি,,ভাল!" হরনাথ কোন উত্তর করিলেন না। অবাক হইয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

"আ মল, এ মিন্‌সে আবার হাঁ করে চেয়ে আছে দেখ," বলিয়া একজন হাসিয়া উঠিল। আর একজন বলিল, "আরে লোকটা পাগল নাকি? না হ'লে অমন করে চেয়ে থাকে, নিশ্চয়ই পাগল। কিরণ, ও কিরণবাবু একবার এস, কেমন মজা দেখবে এস।"

হরনাথ চমকিয়া উঠিলেন, কিরণ! এ যে তাঁহারই পুত্রের নাম! তবে কি সেই! তাঁহার নাতিটির সেই কথা কয়টি হরনাথের মনে পড়িয়া গেল, 'বাবা আপিসেই থাকে, বাড়ী আসে না!'

ভিতর হইতে কিরণ উত্তর করিল, "তোমরা যে খুব হাসছ দেখ্‌ছি! ব্যাপারখানা কি?"

এ যে সেই পরিচিত স্বর! হরনাথ যেন কেমন এক রকম হইয়া গেলেন।

একজন রমণী হাসিতে হাসিতে বলিল, "দেখ্‌বে এস না, ভারি মজা!"

কিরণচন্দ্র রোয়াকে আসিয়া সম্মুখে কপির ঝুড়ি মাথায় হরনাথকে দেখিয়া আড়ষ্ট হইয়া গেল। একি! তাহার মুখ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল! মুহূর্ত্তের মধ্যে কিরণ নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া ছুটিয়া পলাইয়া গেল।

একজন রমণী অমনই হাসিয়া বলিয়া উঠিল, "কিরণের ভয় দেখ্‌লি লা, মুখখানি শুক্‌নো করে পালিয়ে গেল।"

হরনাথ এতক্ষণ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তার পর কোন কথা না বলিয়া ছুটিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া গেলেন। যাইতে

যাইতে তিনি শুনিতে পাইলেন, রমণীরা হাসিয়া চীৎকার করিয়া বলিতেছে, "ওরে দেখ্ দেখ্ পাগলটা কেমন ছুট্‌চে, থাক্‌লে বেশ হ'ত, তাকে নিয়ে রগড় করা যেত।"

[৮]

পথের ধারের দরজা ভেজাইয়া তাহারই ফাঁক দিয়া আকুল নয়নে সুষমা পথের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। বেলা যত বাড়িতেছিল, সে ততই শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল। গাড়ী চাপা পড়েন নি ত! রাস্তায় কেহ ধাক্কা মারিয়া ফেলিয়া দেয় নি ত! এ-রকমের কত অশুভ চিন্তা কেবলই তাহার মনে জাগিতেছিল। কেন সে তাঁহাকে যাইতে দিল, সে যদি তাঁহার পা জড়াইয়া ধরিয়া পড়িয়া থাকিত, তাহা হইলে কি তিনি ঐ অবস্থায় পথে বাহির হইতে পারিতেন। কেন তখন তাহার এ বুদ্ধি আসে নাই! ভগবান্ তাঁহাকে সুস্থ শরীরে ফিরিয়ে এনে দাও।

এমন সময় দরজা ঠেলিয়া কিরণ উন্মাদের মত ভিতরে প্রবেশ করিল। গায়ে জামা নাই, পায়ে জুতা নাই, মাথার চুলগুলি উস্ক-খুস্ক। সুষমা দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। এ কি বেশ! এমন বেশে ত সে তাঁহাকে কোন দিন দেখে নাই।

কিরণ বিকৃতকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বাবা,—বাবা কোথায়?"

সুষমা এ কথার কি উত্তর দিবে! কি করিয়া সে বলিবে, বাবা ফিরি করিতে বাহির হইয়াছেন।

বীরু কাছেই দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু আজ আর সে দৌড়াইয়া গিয়া পিতার হাতটী ধরিতে পারিল না, সে উত্তর করিল, "বাবা, দাদু? দাদু যে কপি বেচতে গেছে। বাবা আমাকে একটা ঝুড়ি কিনে দেবে বাবা, আমি কপি বেচতে যাব।"

কিরণের সারাদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। তাহার চোখের সম্মুখে দিনের উজ্জ্বল আলো যেন ম্লান হইয়া আসিতে লাগিল।

সুষমা তাহার পায়ের উপর আছড়াইয়া পড়িয়া কহিল, "ওগো বাবাকে তুমি বাঁচাও, তিনি যে এই সেদিন ভারি ব্যামো থেকে সবে উঠেচেন, চারটি ভাতের জন্যে যে তিনি কপি বেচতে বেরিয়েছেন। ওগো তুমি তাঁকে রক্ষে কর, বুড়ো মানুষ,—আর এক দিনও বাঁচবেন না। ওগো তুমি যাঁর ছেলে, তিনি কিনা আজ ফিরিয়লা।"

কিরণ কোন উত্তর দিতে পারিল না। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মনে পড়িতে লাগিল, সেই ছেলেবেলার কথা, পিতার সেই স্নেহ, সেই আদর! আর সে কি নিষ্ঠুর, কি নির্ম্মম!

এমন সময় ব্যথিতকণ্ঠে বাহিরে কে "মা, মা," বলিয়া ডাকিয়া উঠিল। সুষমা স্বামীর পা ছাড়িয়া চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার শ্বশুরের কণ্ঠস্বর না? সেই স্নেহের মাতৃ সম্বোধন না? ব্যগ্র নয়নে বাহিরের দিকে সে চাহিয়া দেখিল, তাহার বৃদ্ধ শ্বশুর উপুড় হইয়া রাস্তার উপর পড়িয়া গিয়াছেন, ও তাঁহারাই সম্মুখে কপিগুলি

ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুষমার সমস্ত শরীর হিম হইয়া গেল। সে আর দাঁড়াইতে পারিল না, কাঁপিতে কাঁপিতে স্বামীর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। কিরণ মুহূর্ত্ত পাষাণমূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া থাকিয়া ছুটিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া মূর্চ্ছিত পিতার মস্তক ক্রোড়ে তুলিয়া লইল।

আলেয়া

[১]

সন্ধ্যার পরেই সুরেশ নানাবিধ মিষ্টান্ন লইয়া সহাস্যমুখে গৃহে প্রবেশ করিল। তাহার পত্নী শশিমুখী সবে মাত্র ভাতের হাঁড়িটি উনানে চাপাইয়া দিয়া কন্যাকে কোলে লইয়া উনানের সাম্‌নে বসিয়াছিল। সুরেশ সেইখানে দ্রব্যগুলি নামাইল।

শশিমুখী অবাক হইয়া কহিল, "এত জিনিষ কার গো ?"

সুরেশ হাসিয়া কহিল, "কার আবার, গোটাকতক টাকা লাভ হ'য়ে গেল, তাই কিনে আন্‌লাম !"

তিন বৎসরের কন্যা বিধুমুখী জননীর কোল হইতে উঠিয়া সেই খাবারগুলি আক্রমণ করিতে ছুটিল। শশিমুখী ক্ষিপ্রহস্তে কন্যাকে ধরিতে গেলে, সুরেশ বাধা দিয়া কহিল, "ওকে কেন ধর্‌ছ, নিক্ না ওর যে ক'টা ইচ্ছে।"

শশিমুখী কহিল, "তার পর খেয়ে যখন অসুখ করবে ?"

তৎক্ষণে খুকী দুই হাতে দুইটী বড় বড় সন্দেশ তুলিয়া লইয়া মুখে পুরিবার উদ্যোগ করিতেছিল।

সুরেশ হাসিতে হাসিতে কহিল, "ও সন্দেশগুলো খুব ভাল, ও খেলে খুকীর অসুখ করবে না।"

শশিমুখী কন্যা সম্বন্ধে আর কোন কথা বলিল না। জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গো লাভ হ'ল কি করে শুনি, কুড়িয়ে পেলে না কি ?"

সুরেশ হাসিয়া কহিল, "এক রকম কুড়িয়ে পাওয়া বৈ কি ?" পত্নী কি বলিতে যাইতেছিল, সুরেশ বাধা দিয়া কহিল, "শোনই না আগে সব কথা, তা হ'লেই বুঝবে'খন। হরকুমারকে জান ত, আপিস্ থেকে বেরিয়ে খানিকদূর এসেছি, এমন সময় তার সঙ্গে দেখা, আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'কি হে এত তাড়াতাড়ি কোথায় চলেছ ?' সে বল্লে, 'আজ যে ঘোড়দৌড়, তুমিও চল না হে দেখে আসবে।' অনেক দিন ধরে আমারও ঘোড়-দৌড় দেখ্‌বার ইচ্ছে ছিল। তার সঙ্গে গেলাম ত মাঠে। পথে যেতে যেতে সে বল্লে, 'আর শনিবারে খুব দাঁও মেরে দেওয়া গেছে, মোটে গোটা দশেক টাকা নিয়ে বেরিয়েছিলাম, ফেরবার সময় একেবারে আড়াই শ টাকা নিয়ে ফিরলাম।' আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম, 'বল কি হে, তোমার যে প্রায় এক বছরের মাইনে, আচ্ছা কি করে খেলতে হয়, আমাকে শিখিয়ে দিও দেখি, দু এক টাকা খেলে দেখা যাবে।"

শশিমুখীর বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল! সে তাহার জননীর নিকট সে দিন শুনিয়া আসিয়াছে, তাহার খুল্লতাতভ্রাতা অমল দাদা ঘোড়দৌড় খেলিয়া ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিতে বসিয়াছে,—হু'দিন পরে হয় ত সে পথের ভিখারী হইবে! তাই সে বিষণ্ণমুখে কহিল, "কি সর্ব্বনাশ ঘোড়দৌড় খেল্‌তে গিয়েছিলে?"

সুরেশ হাসিয়া কহিল, "সর্ব্বনাশটা কি হ'ল। এই ত দুটো টাকার বেশী ত খেলিনি, আর দেখ, ঘোড়াটোড়াও আমি চিনি না, হরকুমাররা ত তবু অনেক খবর রাখে। আমি, কিছু না জেনেই প্রথমে গিয়েই এক টাকা লাগিয়ে দিলাম, একেবারে চার চার টাকা এসে গেল, ফের দু'টাকা লাগালাম, ফের তিন টাকা এল, কি মজা বল দিকি, এমনই করে পাচ বাজিতে আমার পনর টাকা লাভ হ'য়ে গেল, তখনও আরও দু বাজি বাকি, বুঝলে, আমি কি তেমনই বোকা, আর খেলি—কি জানি যদি হেরে যাই, ফাঁকি দিয়ে পনর টাকা পাওয়া গেল এই ঢের; এই ভাবা, আর সোজা ট্রামে উঠে সরে পড়া। পথে চার পাঁচ টাকার খাবার কিন্‌লাম। বাকি যে ক'টা টাকা আছে, খুকীর জন্যে একটা ভাল জামা কেনা যাবে, আর তোমার একখানা কাপড়, কি বল?"

শশিমুখী নির্ব্বাক্ হইয়া স্বামীর কথা শুনিতেছিল। তাহার মনের মধ্যে কেমন যেন আপনাআপনি আশঙ্কার মেঘ ঘনাইয়া উঠিতেছিল। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, হায়, এই

ঘোড়দৌড় বুঝি দুষ্ট কপট রাক্ষসের মত আসিয়া তাহাদের সাজান ঘরকন্নাকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়! কিছুরই ত অভাব তাহাদের নাই, স্বামী চাকুরী করিয়া যাহা আনিতেছেন, তাহাতে বেশ সুখশান্তিতে তাহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে, শ্বশুরও অল্প বিস্তর যাহা রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাহাদের জীবনকালে কোন কষ্টই পাইতে হইবে না। চাকুরীতে স্বামীরও দিন দিন উন্নতি হইবে। তাহাদের পুত্রকন্যাগণের অবধি কোন অভাব অনুভব করিতে হইবে না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এই ঘোড়দৌড় খেলার প্রবৃত্তিটা সত্যই যেন শনির মত তাহার স্বামীর হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়াছে; হয় ত ধীরে ধীরে সেই দুষ্ট শনি স্বকার্য্য সাধিতে অগ্রসর হইবে! এই চিন্তায় সে অন্তরের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল! প্রকাশ্যে তাহার স্বামীকে কহিল, "ওগো তোমার দু'খানি পায়ে ধরে বল্‌ছি, তুমি ঘোড়দৌড়ের কথা মন থেকে দূর করে দাও, আমাদের অমন টাকায় কাজ নেই, ভগবান্‌ যা আমাদের দিয়েছেন এই ঢের। খাবারগুলো যা এনেছ, পাড়ার পাঁচজনকে বিলিয়ে দাও, বাকি যে ক'টা টাকা আছে, আমায় দাও, আমি কাল সকালেই গরীবদুঃখীদের তোমার নাম করে বিলিয়ে দেব, তারা মনে মনে তোমায় কত আশীর্ব্বাদ করে যাবে, সেই সঙ্গে তোমার এ শনির দৃষ্টিও কেটে যাবে। তুমি অমল দাদাকে জান ত? ঘোড়দৌড় খেলে তার কি অবস্থা হ'য়েছে বল দিকি! অমন ভাল চাকরী ছিল,

শনিবারে সাহেব সকাল সকাল ছুটি দেয় নি ব'লে সে চাকরীটা কি না এক কথায় ছেড়ে দিলে! অমন সুখের সংসার একেবারে ছারেখারে গেছে। বুড়ো মা, একটি তিন বছরের ছেলে, বউদিদি কি কষ্টই না পাচ্ছে। সে কথা ভাব্‌লেও বুকটা কেঁপে উঠে, দোহাই তোমার, তুমি ও ঘোড়দৌড়ের নাম আর মুখে এন না।"

সুরেশ গম্ভীরভাবে বসিয়া পত্নীর এই কথাগুলি শুনিল। এই কথা লইয়াই সে মনে মনে আলোচনা করিতে লাগিল;—শশীমুখী যাহা বলিল, তাহা খুবই সত্য, ঘোড়দৌড়ে অনেকের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, কিন্তু তাহার সম্বন্ধে শশীর এতটা ভয় পাইবার কোন সঙ্গত কারণই সে খুজিয়া পাইল না। সে ত আর জুয়াড়ী নয়, তাহার এত বড় বয়সের মধ্যে এই ত একদিন মাত্র সে ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিল, পাঁচজন খেলিতেছিল দেখিয়া মাত্র দুইটি টাকা সে খেলিয়াছিল; থিয়েটার দেখিতেও ত এমন দুই চার টাকা ব্যয় হইয়া গিয়াছে। জোর যদি সে দিন কিছু যাইত, না হয় ওই দুইটাকাই! আর ওদিকে না ঘেঁসিলেই ত হইবে। শশীর মন হইতে বৃথা আশঙ্কা দূর করিবার জন্য সে প্রকাশ্যে কহিল, "তোমার যেমন মিছে ভয়, আমি আর ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাচ্ছি না, তা হ'লেই ত হ'ল।"

শশীমুখী তখন ভাতের হাঁড়িটি নামাইয়া ফ্যান গালিবার উদ্যোগ করিতেছিল, খুকী অর্দ্ধভুক্ত সন্দেশ দুইটি তাহার শিথিল মুঠার ভিতর ধরিয়া মেঝের উপর ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল!

শশীমুখী ফ্যান গালিতে গালিতে কহিল, "তা বৈ কি, তোমার ও সব জায়গায় যাবার দরকার কি। আমাদের সেই পুরাণ বাড়ীর জ্যেঠামশায়ের ছেলের কথা শুনে অবধি, ঘোড়দৌড়ের নাম শুনলে বুকটা যেন কেমন ছাঁত করে ওঠে, যাক্ গে ও সব কথা, তুমি ত আর ওদিকে যাচ্ছ না, তা হ'লেই হ'ল। আপিস থেকে এসে হাতমুখ ধোওনি, ধুয়ে এসে খাবার খাও, আমি ততক্ষণে রান্নাবানা সেরে নি।"

সুরেশ কাপড় জামা ছাড়িবার জন্য রান্নাঘর হইতে বাহির হইতে যাইতেছিল, শশীমুখী ডাকিয়া কহিল, "মেয়েটাকে নিয়ে যাও না গো, ওপরে বিছানায় শুইয়ে দাওগে।"

[২]

এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। আবার শনিবার আসিল। সুরেশের এক একবার মনে হইতে লাগিল, একবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে ঘুরিয়া আসে, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার পত্নীর নিষেধবাণী মনে করিয়া জোর করিয়া মন হইতে সে ঘোড়দৌড়ের কথা দূরে ঠেলিয়া দিয়া আপিসের কাজে মনঃসংযোগ করিতে লাগিল। এমনই করিয়া ছুইটা বাজিয়া গেল। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই ছুটি হইবে। সুরেশ তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিতে লাগিল। মুহূর্ত্তপূর্ব্বে সে মনে মনে কল্পনা করিয়াছিল, আজ সে কিছুতেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইবে না। হয় ত সে সঙ্কল্প সে কার্য্যে পরিণত

করিতে পারিত, কিন্তু হরকুমার শনির মত আসিয়া তাহার সমস্ত ওলটপালট করিয়া দিল। সে সবে আপিস হইতে বাহির হইতে যাইবে, এমন সময় ফটকের সম্মুখেই হরকুমারের সহিত দেখা।

হরকুমার তাহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "এই যে সুরেশ, আমি তোমারই খোঁজে যাচ্ছিলাম, ওহে, আজ খুব জোর খবর আছে!" সুরেশ কোন কথা কহিল না। হরকুমার আবার বলিতে লাগিল, "বুঝ্‌লে সুরেশ, নর্টনের আস্তাবলের সহিসের সঙ্গে খুব আলাপ জমিয়ে নেওয়া গেছে, আজ তিনটে ঘোড়ার যা খবর দিয়েছে, তা একবারে নির্ঘাত, তাতে আর মার নেই। দু'চারটে টাকা সঙ্গে আছে ত?"

সুরেশ পলকহীন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। এক দিকে তাহার সমস্ত সুখদুঃখের চিরসহচরী পত্নীর নিষেধ, অন্য দিকে হরকুমারের তীব্র প্রলোভন,—দুইটী বিভিন্নমুখী নদীর প্রবাহের মত এই দুইটী চিন্তা তাহার মনের মধ্যে পাক খাইতে লাগিল। সে যে কি করিবে, তাহা কিছুতেই স্থির করিতে পারিতেছিল না। এমন সময় সম্মুখে ট্রাম আসিতেই হরকুমার তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া ট্রামে তুলিল। কিছু ভাবিয়া স্থির করিবার পূর্ব্বেই সে দেখিল, ট্রামখানি তাহাকে লইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। সে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে ট্রামখানিতে যাত্রীর গাঁদি লাগিয়া গেল। প্রত্যেক বেঞ্চে পাঁচজনের স্থানে সাতজন

করিয়া বসিল। ট্রামখানির সম্মুখে পিছনে কোন প্রকারে তুই খানি পা রাখিবার জন্য ঠেলাঠেলি হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। সহসা কোন দুর্গ শত্রুকর্তৃক আক্রান্ত হইলে, দুর্গরক্ষকেরা যেরূপ ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া থাকে, এই লোকগুলি বোধ করি, তদপেক্ষা কম ব্যস্ততা প্রকাশ করিতেছিল না।

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় সুরেশের কানের চারিদিকে কেবলই ঘোড়-দৌড়ের কথা ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কেহ বলিল, অমুক ঘোড়া জিতিবে, অপর একজন অমনই বলিয়া উঠিল, ও ঘোড়াটা কিছুতেই জিতিতে পারে না, আমি টমাস সাহেবের আস্তাবলের খবর পাইয়াছি, দশ নম্বরের ঘোড়াটা আজ নিশ্চয়ই বাজি মারিবে, খুব দর পাওয়া যাইবে হে, দশের কম ত কিছুতেই নয়। দুই এক ব্যক্তি আবার আপনাআপনিই একবার এ ঘোড়া একবার সে ঘোড়ার নাম করিতে লাগিল। এমনই উৎকণ্ঠিত যাত্রিবর্গ লইয়া ট্রাম তাহাদের সেই বাঞ্ছিত মহাতীর্থে নামাইয়া দিল। মহাকলরব করিতে করিতে সম্ভাবিত জয়াশায় উল্লসিত সৈন্যদেরই মত তাহারা ক্রীড়াক্ষেত্রে গিয়া সমবেত হইতে লাগিল।

সেদিনও সুরেশ তেইশ টাকা জিতিল। উৎকণ্ঠা-উপশমিত হৃদয়ে প্রফুল্ল মুখে সে বাটীর অভিমুখে ফিরিল। পথে যাইতে যাইতে সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—লোকে বলে বটে, ঘোড়দৌড় খেলিয়া অনেকের ভিটামাটি উচ্ছন্ন গিয়াছে। কিন্তু এই দুই দিনেই আমি বেশ বুঝিলাম, লোকের ধারণা অমূলক; বুঝিয়া

হিসাব করিয়া খেলিলে হারের কোন সম্ভাবনা নাই! যদি হারিতেই হয়, তাহা হইলে ঐ জিতের টাকা কয়টার বেশী ত আর যাইবে না। শশিমুখী ত ঘোড়দৌড়ের ব্যাপার কিছুই জানে না, তাহার নিকট হয় ত কেহ গল্প করিয়া থাকিবে, অমুকের ঘোড়দৌড়ে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাই সে ঘোড়দৌড়ের নামে অতটা বিচলিত হইয়া উঠে। নানাদিকে নানারকম করিয়া সে ঘোড়দৌড় খেলার সম্বন্ধে আলোচনা করিল, কিন্তু ইহাতে লোকে যে কি করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হয়, তাহা সে কিছুতেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে সে গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেই তাহার চিন্তার গতি অন্যদিকে ফিরিয়া গেল। শশিমুখীকে এ কথা জনাইবে কি না? জানাইলেই বা দোষ কি। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখে পত্নীকে দেখিয়া সে আর কিছু বলিতে পারিল না। শশীমুখী ব্যগ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আপিস থেকে ফিরতে এত রাত হ'ল যে? ঘোড়দৌড়ে যাও নি ত?"

সুরেশ প্রথমটা একটু ইতস্ততঃ করিল, তাহার পর মুখের উপর হাসি টানিয়া আনিয়া কহিল, "তুমিও যেমন, আর আমি সেমুখো হই, ঘোড়দৌড় আবার ভদ্রলোকের খেলা। আজ দশ বছর পরে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা, তাই তার সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে এত দেরী হ'য়ে গেল; সে এমনই বক্‌তে পারে! শরীরটা যেন একেবারে ঝিমিয়ে গেছে, শীগ্‌গির এক পেয়ালা চা করে দাও দিকি।"

শশিমুখী এ কথা অবিশ্বাস করিতে পারিল না, হাসিয়া কহিল, "তাই ভাল, আমার ত সত্যি ভাবনা হয়েছিল ; শনিবার, তুমি বুঝি আবার ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়েছিলে। যাক্‌গে, তুমি এখন হাত মুখ ধোও, আমি ততক্ষণে চা তৈরী করে আনি।"

সুরেশ আপিসের কাপড় ছাড়িতে ছাড়িতে মনে মনে ভাবিল, না বলিয়া ভালই করিয়াছি।

আজ সাতবৎসর সুরেশের বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘ সাত বৎসরের মধ্যে সে তাহার স্ত্রীর নিকট একটি কথাও গোপন করে নাই। কিন্তু আজ হঠাৎ সে স্ত্রীর সম্মুখে এত বড় মিথ্যা কথাটা বলিয়া বসিল!

সুরেশ জামা কাপড় ছাড়িয়া দালানের তক্তপোষের উপর রাখিয়া হাত মুখ ধুইয়া সেইখানে ফিরিয়া আসিতেই শশিমুখী চা লইয়া উপস্থিত হইল। শশিমুখীর কোলে তাহার কন্যাটি এবং হাতে চায়ের পেয়ালা ছিল ; কন্যাটিকে তক্তপোষের উপর বসাইয়া চায়ের পেয়ালাটী সে স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল।

সুরেশ অন্যমনস্কভাবে চা খাইতে লাগিল। শশিমুখী পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। অন্য দিন সুরেশ পত্নীর সহিত আপিসের কত গল্প করিত, কিন্তু আজ সে একটা কথাও বলিল না। অপরাধীর মত সে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। শশিমুখী যে তাহার এ ভাব লক্ষ্য করিল না, তাহা নহে, কিন্তু কেন যে তাহার স্বামী আজ এরূপ অন্যমনস্ক তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। তাহার স্বামী

যে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়াছিল এবং সে কথা তাহার নিকট গোপন করিয়াছে, এ কথা তাহার একবারও মনের মধ্যে উদিত হয় নাই; তাঁহার স্বামী যে কোন কথা তাহার নিকট হইতে গোপন করিবে, একথা সে যে কল্পনাও করিতে পারে না। তাই তাহার মনের মধ্যে আশঙ্কা হইতে লাগিল, তাহার স্বামীর নিশ্চয়ই কোনরূপ অসুখ করিয়াছে। সে প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাগো, তোমার কি হ'য়েছে?"

সুরেশ হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিল। মুখ তুলিয়া পত্নীর দিকে চাহিয়াই সে আবার মুখটি নীচু করিল। শশীর মুখখানা আশঙ্কার অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়াছিল। সুরেশের মনে হইল, শশী নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিয়াছে যে, সে ঘোড়দৌড়ের মাঠে গিয়াছিল। তাই সে পত্নীর ব্যাকুল প্রশ্নের সহসা কোন উত্তর করিতে পারিল না। শশী আরও ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "চুপ করে রইলে যে? তোমার পায়ে পড়ি, লুকিয়ো না, সত্যি বল, তোমার কি হ'য়েছে? আজ এই সাত বৎসরের মধ্যে আমার কাছে ত তুমি কখনও কিছু লুকোও নি।"

পত্নীর এই ব্যথিত কণ্ঠস্বরে সুরেশ মনে মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিল। তাঁহার ইচ্ছা হইতে লাগিল, শশীকে বলিয়া ফেলে, "আমি তোমায় লুকিয়ে ঘোড়দৌড় খেল্‌তে গিয়েছিলাম, এবারটির মত ক্ষমা কর, আর কখনও যাব না।" কিন্তু আবার ভাবিল, ঘোড়দৌড়ের নামে শশী যেরূপ উদ্বিগ্ন ও বিচলিত হইয়া উঠে,

তাহাতে তাহাকে না বলাই ভাল। সে যে কি বলিবে ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না, এমন সময় বাহিরে কে একজন তাহার নাম ধরিয়া ডাকিতেই সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেল; পত্নীর ব্যগ্র প্রশ্নের উত্তর দিবার হাত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সে সত্যই যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। যাইবার সময় পত্নীকে বলিয়া গেল, "আমার অসুখটসুখ কিছু করেনি, একটু মাথা ধরেছিল, তার জন্য অত ভাবচ কেন; যাই, কে ডাক্‌ছে শুনে আসি।"

সুরেশ চলিয়া গেল, শশী খানিকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সে স্পষ্ট বুঝিল, তাহার স্বামী যেন তাহার নিকট হইতে কি একটা লুকাইবার জন্য ব্যস্ত। এতদিন পরে কি কারণে সে যে তাহার স্বামীর বিশ্বাস হারাইতে বসিল, তাহা সে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। সে যে বিশ্বাস হারাইতে বসিয়াছে, সুধু এই কথা মনে হইবামাত্র তাহার ব্যথিত অন্তর তীব্র হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল! সে দুই হাতে বুক চাপিয়া স্বামী-পরিত্যক্ত সেই স্থানটিতে বসিয়া পড়িল। কিন্তু বেশীক্ষণ সে বসিতে পারিল না, স্বামী আপিস হইতে ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত হইয়া আসিয়াছেন, এখনই তাঁহার আহার প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। তক্তপোষের একধারে সুরেশের আপিসের জামাটি পড়িয়াছিল। শশী পাশের আন্‌লার উপর সেটাকে ঝুলাইয়া রাখিয়া রান্নাঘরের অভিমুখে যাইতেছিল। জামাটি মাটিতে পড়িয়া যাওয়ায়, সেটা আবার তুলিতে গিয়া দেখিল, পকেট

হইতে কতকগুলি কাগজ মেঝের উপর ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সেই গুলি কুড়াইতে কুড়াইতে দুইখানির উপর তাহার চোখ পড়িতেই সে আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া গেল! এ যে ঘোড়দৌড়ের টিকিট! কাল শনিবার—ঘোড়দৌড়ের দিন। তাহার আর বুঝিতে বাকি রহিল না, তাহার স্বামী তাহাকে লুকাইয়া ঘোড়দৌড় খেলিতে গিয়াছিলেন। সেই কথা গোপন রাখিবার জন্য তাহার স্বামীকে আজ মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে! সে খানিকক্ষণ কি ভাবিল, তাহার পর রান্নাঘরে চলিয়া গেল।

[৩]

মাস দুই পরে এক শনিবারে সুরেশ আপিসে বসিয়া তাড়াতাড়ি তাহার হাতের কাজ সারিতেছিল ও এক একবার ফাইল হইতে মুখ তুলিয়া ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিতেছিল। প্রায় দেড়টা হইয়া আসিয়াছে। আর আধঘণ্টার মধ্যে সে সমস্ত কাজ সারিয়া ফেলিতে পারিবে। এমন সময় বেহারা আসিয়া একটা প্রকাণ্ড ফাইল তাহার টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। সুরেশ চমকিত হইয়া মুখ তুলিয়া চাহিয়া বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এ কিসের ফাইল রে, এমন অবেলায় নিয়ে এলি?"

বেহারা কহিল, "আজ্ঞে, বড়বাবু বলে দিলেন জরুরি কাজ।"

সুরেশ ফাইলের দিকে চাহিয়া দেখিল, লালকাগজে আঁটা রহিয়াছে, "জরুরি।" বড়বাবু লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, এই ফাইলটি

আজ শেষ করিয়া যাইতে হইবে। সুরেশ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। সর্ব্বনাশ! এ শেষ করিতে ত চারিটা বাজিয়া যাইবে। গত শনিবার অনেকগুলো টাকা সে হারিয়া আসিয়াছে, আজ সেই টাকা তুলিবার দিন। এখন সে কি করিবে! ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিল, দুইটা বাজিয়া গিয়াছে, আর বিলম্ব করিলে সে সময় মত পৌঁছিতে পারিবে না! তাই তাড়াতাড়ি কলমটা ফেলিয়া দ্রুতপদে বড়বাবুর ঘরে গিয়া সে হাজির হইয়া কহিল, "মশায়, আজ আড়াইটের সময় আমার এক জায়গায় বিশেষ দরকার। আপনি যে কাজ পাঠিয়েছেন, আমি সোমবার এসে করে দেব।"

বড়বাবু অবাক হইয়া কহিলেন, "তুমি বল কি হে, একি ঘরের কাজ পেলে যে পরে এসে করে দেবে। যাও, কাজটা সেরে তারপর বাড়ী যেও।"

সুরেশের মাথার মধ্যে তখন আগুন জ্বলিতেছিল। সে নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়বাবু কাগজ হইতে মুখ না তুলিয়া কহিলেন, "দাঁড়িয়ে রইলে যে, চারটের মধ্যে কাজটা সেরে দেওয়া চাই, জরুরি কাজ, বড় সাহেবের দরকার।"

সুরেশ তবুও আত্মসংবরণ করিয়া কহিল, "আজ আমি কিছুতেই পারব না মশায়। দেরী হ'লে আমার ভয়ানক ক্ষতি হ'বে, আপনি অন্য কাউকে দিয়ে করে নিন।"

বড়বাবু উষ্ণ হইয়া কহিলেন, "কাজ না সারলে আজ কিছুতেই ছুটি পাবেনা। যাও বিরক্ত কর না।"

কথায় কথায় প্রায় দশ মিনিট কাটিয়া গেল। তিনটার সময় ঘোড়দৌড় আরম্ভ, সুরেশ উত্তেজিত হইয়া কহিল, "আমি আজ কিছুতেই পারবনা, আপনি যাকে দিয়ে হ'ক কাজটা করিয়ে নিন।"

বড়বাবু চীৎকার করিয়া কহিলেন, "তোমার হুকুমে! তোমায় করতেই হ'বে।"

সুরেশও উচ্চকণ্ঠে উত্তর করিল, "আমি কিছুতেই করতে পারব না। আপনি যা করতে পারেন করবেন।"

বলিয়া সুরেশ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বড়বাবু হাঁকিয়া কহিলেন, "বেয়াদব, এখনই তুমি আপিস থেকে বেরিয়ে যাও।"

সুরেশ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধ কম্পিতকণ্ঠে কহিল, "ভারি ভয় দেখাচ্ছেন! রইল আপনার চাকরি, ভারি ত পঞ্চাশ টাকা মাইনের চাকরি, একমাস হাড়ভাঙ্গা খাটলে পঞ্চাশ টাকা পাই, অমন পঞ্চাশ টাকা আমি তিন ঘণ্টায় রোজগার করতে পারি।" বলিয়া কোন উত্তরের অপেক্ষা না রাখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

দিন পাঁচেক পরে একদিন শশীমুখী জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁগো আপিস যাবে না?"

সুরেশ একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "তোমাকে বলব বলব করে বলা হয়নি, আজ পাঁচদিন হ'ল কাজ ছেড়ে দিয়ে এসেছি।

আর গালাগালি সহ্য হ'ল না। সারাদিন এই খাটুনি, তার ওপর কেবলই গালাগালি, কত সহ্য হয় বল দিকি ?"

শশিমুখী অন্তরে বেদনা অনুভব করিয়া সহানুভূতির স্বরে কহিল, "তা সত্যিই ত, এই হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটিয়ে নিয়ে আবার গালাগালি! তাদের শরীরে মায়া দয়া নেই বাপু। ভালই হ'য়েছে, তোমার শরীরটা ক'দিন থেকে ভাল বোধ হ'চ্ছিল না, কদিন জিরিয়ে নাও, তারপর একটা কাজ দেখে নিলেই চল্‌বে।"

সুরেশ সংক্ষেপে কহিল, "তা বৈ কি।"

বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গিয়াছে। শশীর অনেকক্ষণ রান্না হইয়া গেছে, সে ভাতের হাড়ীর সম্মুখে বসিয়া বসিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সুরেশ তখন বাহিরের ঘরে কাহার সহিত এমন গল্পে মাতিয়াছে যে, আহারের কথা তাহার একেবারে মনেই নাই। তাহাদের হাসির রব থাকিয়া থাকিয়া রান্না ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিতেছে। শশিমুখীর আর বসিয়া থাকিতে ভাল লাগিল না। উঠিয়া গিয়া বাহিরের ঘরের পর্দার অন্তরালে দাঁড়াইয়া অতি সন্তর্পণে পর্দা সরাইয়া একবার সে বাহিরের ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করিয়াই হাত টানিয়া লইল। একজনকে যেন তাহার চেনাচেনা ঠেকিল। তাহার বোধ হইল, তাহাদের বাড়ীতে যে মুসলমান জেলেটা মাঝে মাঝে মাছ বেচিতে আসিত, ঠিক সেই রকমের কে একজন ফরাসের একধারে বসিয়া আছে, আর তাহার স্বামী তাহারই কাঁধে হাত রাখিয়া দাঁড়াইয়া গল্প করিতেছেন।

আধঘণ্টা পরে সুরেশ ভিতরে আসিলে শশিমুখী জিজ্ঞাসা করিল, "ভাত যে একেবারে শুকিয়ে গেল!" তারপর একটু থামিয়া আবার কহিল, "আচ্ছা, বাইরে কার সঙ্গে গল্প করছিলে, যেন চেনা-চেনা বোধ হ'ল?"

সুরেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "ও আমাদের সেই কাসেম জেলে গো?"

শশী কহিল, "আমারও তাই বোধ হ'য়েছিল, তা ওকে আবার ফরাসের ওপর বসান কেন, লোকে যদি দেখে কি মনে করবে বল ত?"

সুরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "না না, ও ভারি কাজের লোক ও যা টিপ্ বল্‌তে পারে,—"বলিয়া হঠাৎ সে থামিয়া গেল। ফস্ করিয়া এই টিপের কথা উল্লেখ করিয়া সে মনে মনে ভারি উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল। এতদিন যে কথা সে অতি যত্নে পত্নীর নিকট হইতে গোপন করিয়া আসিতেছিল, আজ কথার ঝোঁকে তাহা প্রকাশ করিয়া ফেলিয়া সে বিষম বিব্রত হইয়া পড়িল। তাই আর কোন কথা না বলিয়া তাড়াতাড়ি সে স্নান করিতে চলিয়া গেল। শশিমুখী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রান্নাঘরে প্রবেশ করিল।

[৪]

আর এক শনিবার। সুরেশ উপর হইতে নামিতে গিয়া দেখিল, শশীমুখী সিঁড়ির ঠিক নীচে মেঝের উপর দুই হাতে বুক চাপিয়া

পড়িয়া আছে। সুরেশ ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি হ'য়েছে গো তোমার, এমন করে পড়ে আছ যে?"

শশী ধীরে ধীরে মুখ তুলিয়া ব্যথিত কণ্ঠে কহিল, "আমার বুকে পিঠে ভারি ব্যথা ধরেছে, আমি উঠ্‌তে পার্‌ছি না। আমার বুকটায় একটু হাত বুলিয়ে দাও না।" কত কষ্টে যে শশী এই কথাগুলি বলিল, তাহা অন্তর্য্যামীই জানেন!

সুরেশের সেদিন এমনই একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর পত্নীর এই আকস্মিক পীড়ায় সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিল। সে ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার ব্যথাটা কি খুব বেশী? আমার যে এখনই বিশেষ কাজ আছে।"

কাজটা যে কি তাহা শশীর বুঝিতে বাকি রহিল না। তাহার বুক ফাটিয়া কান্না আসিতে চাহিল। সে কোন কথা বলিতে পারিল না।

সুরেশ আরও ব্যস্ত হইয়া কহিল, "চুপ করে রইলে যে, ব্যথা কি খুব বেশী? আমার যে একজনের সঙ্গে এখনই দেখা করতে হ'বে, না হ'লে চাকরীটা হাতছাড়া হ'য়ে যাবে।"

সুরেশ মনে করিল, চাকরীর কথা শুনিয়া শশীর মনে খুব আনন্দ হইবে, তাহা হইলে হয় ত তাহার ব্যথাটা একটু কমিয়া যাইতে পারে। কিন্তু তাহা হইল না। শশী কাঁদিয়া ফেলিল! তাহার পীড়ার কথা শুনিয়া তাহাকে একলা ফেলিয়া প্রতারণা করিয়া তাহার স্বামী ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে! শশীর

মনে পড়িল, এমন দিন গিয়াছে, যে দিন শশীর মাথা ধরিয়াছে শুনিলে সুরেশ আর সে দিন আপিস অবধি যায় নাই। শশীর ইচ্ছা হইতে লাগিল, সে বলিয়া ফেলে, "ওগো তুমি যাও।" কিন্তু পরক্ষণেই সে স্থির করিল, এই আলেয়ার আকর্ষণের হাত হইতে স্বামীকে উদ্ধার করিবার জন্য তাহাকে একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিতেই হইবে।

আজ এক বৎসরের উপর সুরেশ চাকুরী ছাড়িয়া ঘোড়দৌড় মাতিয়াছে এবং এই আলেয়ার পাছে পাছে অন্ধ আবেগে ছুটিতে ছুটিতে কোথায় কত দূরে আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা শশিমুখী ঠিক না বুঝিলেও এটা বুঝিয়াছিল যে, তাহাদের পাতান সংসার ছারে-খারে যাইতে বসিয়াছে! এই একবৎসরে সুরেশের আর কিছু লাভ হউক আর না হউক, মধুচক্রের চারিধারে মৌমাছির মত বন্ধুর দলে তাহার বাড়ী ছাইয়া ফেলিয়াছিল। সপ্তাহে এক দিন, মাঝে মাঝে দুই দিনও তাহার গৃহে কাসেম জেলে, নিমাই ছুতোর, হরে বোষ্টম, নিতাই যুগী, জগাই কাঁসারি, পিরবক্স খানসামা প্রভৃতি বন্ধুগণের মাংস পোলাওয়ের প্রীতিভোজ চলিত। শশীমুখী কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার সমস্ত আয়োজন করিয়া দিত! কি করিয়া সে তাহার স্বামীকে এই সর্ব্বনেশে বিপদ হইতে ফিরাইয়া আনিবে, মনে মনে তাহার কত উপায়ই না সে গড়িয়া তুলিয়াছে, আবার ভাঙ্গিয়াছে, আবার গড়িয়া তুলিয়াছে। আজ সে স্থির করিয়াছিল, অসুখের ভান করিয়াই হউক, আর যে ভাবেই হউক না কেন, সে আজ তাহার

স্বামীকে কিছুতেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যাইতে দিবে না! স্বামীকে ফিরাইবার জন্য অন্ততঃ সে একবার শেষ চেষ্টা করিয়া দেখিবে!

তাই বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে সে কহিল, "ওগো তোমার দু'খানি পায়ে পড়ি, আমায় আজ একলা ফেলে তুমি কোথাও যেয়ো না, তা হ'লে আমি বাঁচব না। ওগো, দুখানি পায়ে ধরে মিনতি কর্‌ছি, তুমি যেও না—আমায় যে দেখ্‌বার কেউ নেই।"

সুরেশ মহা বিপন্ন হইয়া ভাবিতে লাগিল, কাহার তত্ত্বাবধানে সে তাহার পীড়িতা পত্নীকে রাখিয়া যাইবে। এমন সময় বাহিরে হরে বোষ্টম হাঁকিল, "সুরেশবাবু এস না হে, মোটর এসেছে, জগাই নিতাই ভারি ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছে।"

সুরেশ অত্যন্ত বিব্রত হইয়া কহিল, "ওই শোন, ওরা ডাকাডাকি কর্‌ছে, এখন না গেলে সব মাটি হ'য়ে যাবে, তোমার অসুখ, কি করি!"

শশী আর নিজেকে সামলাইতে পারিল না। সে উঠিয়া বসিয়া দুই হাতে স্বামীর পা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "আজ আমি তোমায় কিছুতেই ঘোড়দৌড়ের মাঠে যেতে দেব না। অমন পয়সায় আমাদের দরকার নেই।"

শশীর এই অদ্ভুত অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে সুরেশ হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। বাহিরে তাহার সঙ্গিগণের ঘন ঘন চীৎকারে পাড়ার লোক অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল, কেহ কেহ বা তাহাদের উদ্দেশে গালিবর্ষণও করিতে লাগিল।

সুরেশেরও আজ না যাইলে নয়। তাহার পিতৃদত্ত যাহা-কিছু নগদ টাকা ছিল এবং কয় বৎসরের চাকরী করিয়া অল্প যাহা-কিছু সে জমাইয়াছিল, তাহা ক্রমে ক্রমে নিঃশেষ হইয়া গেছে। তাহার বন্ধুরা বরাবর বুঝাইয়া আসিয়াছে এবং এখনও আসিতেছে যে, অমন পাঁচ দিনে পাঁচশত টাকা চলিয়া যায়, কিন্তু আবার একদিনে পাঁচ হাজার আসিয়া পড়ে। এ যাওয়া-আসার এমনই বিচিত্র গতি! কখন যে কি ভাবে কোন্ দিক্ দিয়া দেখিতে দেখিতে হাতের কড়ি একেবারে নিঃশেষ হইয়া যায়, তাহা যেমন কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে না, তেমনই এক-দিনে আর পাঁচজন হতভাগ্যের কত কষ্টসঞ্চিত অর্থ একত্র হইয়া কি করিয়া যে আর একজনের হাতে আসিয়া উঠে, তাহাও কেহ ভাবিয়া ঠিক করিতে পারে না। সুরেশের সমস্ত টাকাই তাহার বুঝিবার পূর্ব্বেই এইভাবে চলিয়া গিয়াছে! তাহার হাতে নগদ টাকা বলিতে আর একটিও নাই, তাই পরমহিতার্থী বন্ধুবর্গের সুপরামর্শে ও চেষ্টার ফলে বাস্তুভিটাটি বন্ধক রাখিয়া তাহার হাতে আবার অর্থাগম হইয়াছে। বিশেষ প্রয়োজন এবং তাড়াতাড়ি বলিয়া সুদের হারটা শতকরা আঠার টাকা হইয়াছে; তাঁহার বন্ধুগণ বুঝাইয়া দিয়াছে, চব্বিশ টাকা সুদ হইলেও কোন লোকসান ছিল না! একদিনে যদি তিনটা বাজি মারিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে এক দিনেই পাঁচ বৎসরের সুদ আদায় হইয়া আসিবে। সুদের আবার ভাবনা!

সুরেশ আজ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া তাহার হারাণ টাকা উদ্ধার করিবার আয়োজনে বাহির হইতেছে, আর তাহার নির্ব্বোধ পত্নী এমনই করিয়া সব পণ্ড করিয়া দিবে! ইহা কিছুতেই হইতে পারে না!

সুরেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, "কি কর, পা ছেড়ে দাও, মিছিমিছি অসুখের কথা বলে আমার দেরী করে দিলে, তোমরা কাজের বেলায় কোন খোঁজ খবর রাখ না, কেবল বাধা দিতেই মজবুত।"

শশী বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "তুমি যাই বল না কেন, আমি কিছুতেই তেমোর পা ছাড়্‌ব না, তোমায় যেতে দেব না।"

বাহির হইতে জগাই যুগী আবার হাঁকিল, "ওহে সুরেশবাবু, ব্যাপারটি কি বল দিকি, না যাও সোজা বলে দাও, তোমার জন্যে আমাদেরও দিনটা মাটি হ'য়ে যাবে না কি?"

সুরেশ পাদপতিতা পত্নীর বন্ধন হইতে নিজকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়া বিফলমনোরথ হইয়া অত্যন্ত রাগিয়া কহিল, "শীগ্‌গির পা ছেড়ে দাও, না হ'লে ভাল হ'বে না বল্‌ছি।"

শশী কোন উত্তর করিল না, পাও ছাড়িল না। বরং আরও সবলে স্বামীর পা চাপিয়া ধরিয়া পায়ের উপর মাথা রাখিয়া কাঁদিতে লাগিল।

বাহির হইতে হরে বোষ্টম চীৎকার করিয়া কহিল, "তা হ'লে আমরা চল্লাম হে সুরেশ, আর দেরী কর্‌তে পারি না।"

সুরেশের বোধ হইল, সত্যই যেন তাহারা চলিয়া গেল। সে উন্মত্তবৎ এমন জোরে পা টানিল যে, শশী ললাটে বিষম আঘাত পাইয়া সেইখানে ঢলিয়া পড়িল, তাহার নাক মুখ দিয়া রক্ত ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। সুরেশ তাহা দেখিয়াও ফিরিল না, দ্রুতপদে বাটীর বাহির হইয়া গেল।

[৫]

মাস ছয়েক পরে একদিন শশী তাহার মেয়েটিকে কোলে করিয়া বারান্দায় বসিয়াছিল। সুরেশ বাড়ী ছিল না। শশী বসিয়া বসিয়া কত কথাই না ভাবিতেছিল, কি সুখের পর কি দুঃখেই তাহারা পড়িয়াছে। এখনও ফিরবার সময় আছে, কিন্তু উপায় নাই। ছয়মাস পূর্ব্বে যে দিন সুরেশ তাহাকে লাথি মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহার পর হইতে সে আর বাধা দিতে যায় নাই, কারণ, তাহাতে ফল ভাল না হইয়া আরও মন্দ দাঁড়াইয়াছে। সে তখন অন্য পথ ধরিয়াছে, পুরোহিত ডাকিয়া লুকাইয়া শান্তি স্বস্ত্যয়ন আরম্ভ করিয়াছে। বেলা প্রায় পড়িয়া আসিয়াছিল, শশীর জ্যেঠামহাশয়ের বড় ছেলে, তাহাদের বড়দাদা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শশী উঠিয়া গলায় অঞ্চল দিয়া প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিয়া জিজ্ঞসা করিল, "বড়দা, তোমাদের সব খবর ভাল ত, অনেকদিন তোমাদের খবর পাই নি।"

বড়দাদা কহিলেন, "হ্যাঁরে, নানা কাজে আসা ঘটে ওঠে নি। সুরেশ কোথায় রে?"

শশী কহিল, "কোথায় বেরিয়েছেন।"

বড়দাদা কহিল, "কখন ফিরবে বলতে পারিস?"

শশী কহিল, "তা ত বলতে পারি না বড়দা।"

বড়দাদা কহিল, "তাই ত, আমি ত বেশী দেরী করতে পারব না। তার কাছে একটু দরকার ছিল।" তারপর একটু থামিয়া আবার বলিল, "না, তা এমন কিছু না, তুই কোথায় নেমন্তন্নে যাবি বলে সুরেশ তোর বউদিদিদির কাছ থেকে হারছড়া চেয়ে এনেছিল, সেই হারটা যে একবার চাই।"

বড়দাদার কথায় শশী আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাহার বুকের মধ্যে কেমন করিয়া উঠিল। কি সর্ব্বনাশ! কোথায় নিমন্ত্রণ, আর কোথায় বা তাহার বউদিদির হার! তাহার স্বামী যে মিথ্যা কথা বলিয়া হারছড়াটি আনিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া লজ্জা ও ভয়ে সে অন্তরের মধ্যে শিহরিয়া উঠিল! যদি হারছড়া তিনি নষ্ট করিয়া থাকেন, তবে কি সর্ব্বনাশ হইবে! কিন্তু স্বামী না আসা অবধি তাহাকে ত কোন রকমে এ বিষয়ে ঢাকিয়া লইতে হইবে। তাই যথাসম্ভব মনের চাঞ্চল্য গোপন করিয়া সে বড়দাদাকে কহিল, "তিনি ফিরে এলেই আমি পাঠিয়ে দেব'খন বড়দা।"

বড়দাদা চলিয়া যাইবার পর সে মনে মনে স্থির করিল, যদি তাহার স্বামী হারছড়া নষ্ট করিয়াই থাকেন, তাহা হইলে তাহার

নিজের একছড়া হার পাঠাইয়া দিয়া এ অপবাদের হাত হইতে স্বামীকে রক্ষা করিতে হইবে! তার পর সে যেন কি ভাবিয়া উপরে চলিয়া গেল এবং গহনার বাক্স খুলিতেই গালে হাত দিয়া সেইখানে বসিয়া পড়িল। বাক্স একবারে শূন্য পড়িয়া আছে, তাহার মধ্যে একখানি অলঙ্কারও নাই। তাহার মেয়ের অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বাপের বাড়ী হইতে খুকীকে যে হারছড়া ও কয়গাছি চুড়ি দিয়াছিল, তাহাও নাই। সে যে বড় আশা করিয়াছিল, তাহার নিজের হার পাঠাইয়া বউদিদির ঋণ শোধ করিবে! হা ভগবান্, এমনই করিয়া তাহার শেষ আশা নির্ম্মূল করিয়া দিলে! তাহার স্বামী যে তাহার কোন অনুরোধ উপরোধের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সর্ব্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছে এটা সে বুঝিতেছিল, কিন্তু ব্যাপার যে এতদূর গড়াইয়াছে, তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। তাহার অন্তর কাঁপিয়া উঠিল, আর বুঝি পথে দাঁড়াইবার বিলম্ব নাই! সে ভগবান্‌কে প্রাণপণে ডাকিয়া বলিতে লাগিল, "হে হরি, তোমায় এত করিয়া ডাকিলাম, তবুও একবার অভাগিনীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিলে না, দয়া করিলে না! এখনও তাঁকে সর্ব্বনাশের পথ হইতে ফিরাইয়া আনিয়া দাও ঠাকুর!"

রাত্রি প্রায় একটা। খুকীকে শোয়াইয়া দিয়া শশী [illegible] চিত্তে স্বামীর জন্য বসিয়াছিল। এমন সময় সুরেশ টলিতে টলিতে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার সারা দেহে কাদা মাখা। জামার পিছনের দিকটা একেবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। পায়ে

একপাটি জুতা নাই। দুইটী চক্ষু জবাফুলের মত ...
সে আসিয়াই অবসন্ন দেহে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। মাথা
সেই সঙ্গে সঙ্গে তাহার কোলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। পূ...
মাঝে মাঝে রাত করিয়া বাড়ী ফিরিয়াছে, এমন কি দু...
শশী তাহার মুখে মদের গন্ধও পাইয়াছে, কিন্তু এমন দীন ...
এমন মত্তাবস্থায় সে তাহাকে কোন দিন দেখে নাই।

খানিকক্ষণ সে যখন একটু প্রকৃতিস্থ হইল, তখন সে একবার
ভাল করিয়া চারিদিক চাহিয়া দেখিল। এ যে তাহা... গৃহ,
তাহার শিয়রে বসিয়া তাহার পত্নী পাখা লইয়া বাতাস করিতে...
সে প্রথমটা কিছু বলিতে পারিল না, তারপর ব্যথিতক... কল
"শশি!"

তাহার এই সহজ কণ্ঠস্বরে শশীর মনের ভারটা অনেক ... হইয়া
গেল। সে আর্দ্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এ...
ভাল বোধ হ'চ্ছে?"

সুরেশ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "হ্যাঁ শশি।"
হঠাৎ উঠিয়া বসিয়া শশীর দুইখানি হাত চাপিয়া ধরিয়া ...
"আমায় মাপ কর শশি, তোমার কথা না শুনে, না বুঝে
নিজের সর্ব্বনাশ করেছি, তোমাদের পথে বসিয়েছি।"

শশী বাধা দিয়া কহিল, "না না অমন কর না, ...
হাওয়া করি। তাতে হ'য়েছে কি! অমন ভুল লোকের ...
এখন বুঝতে পেরেছ, আর কোন কষ্ট থাকবে না!"

সুরেশ পত্নীর কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া কহিল, "তুমি কিছু জান না তাই একথা বলছ। আমি যে তোমাদের পথের ভিখারী করেছি, বাড়ী বন্ধক দিয়েছি, তোমার গয়নাগুলো চুরি করে আধা কড়িতে বেচেছি—তোমার বউদিদির গয়না ফাঁকি দিয়ে এনেছি—",

শশীর বুকটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিলেও সে তাহা সামলাইয়া লইয়া বাধা দিয়া কহিল, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, ও সব কথা শুনিয়ো না—আমার গয়নায় দরকার নেই; ভগবান্ তোমায় যে সুমতি দিয়েছেন এই আমার যথেষ্ট। তুমি পুরুষমানুষ, তোমার আবার ভাবনা কিসের, যা গেছে আবার ফিরে আসতে কতক্ষণ!"

সুরেশ কাঁদিয়া ফেলিল, ক্রন্দনজড়িতকণ্ঠে কহিল, "পাড়ার লোকের কাছ থেকে ফাঁকি দিয়ে টাকা নিয়েছি, তারা পথেঘাটে আমায় জোচ্চোর বলে গাল দিচ্ছে। কাবুলিওয়ালার কাছে টাকায় দুআনা সুদে দশ টাকা ধার করেছি, কাল সন্ধ্যে থেকে তারা সুদের জন্যে লাঠি হাতে আমার পেছনে পেছনে বেড়িয়েছে—শাসিয়ে গেছে কাল পথে ধরে মারবে, আমায় খানিকটা বিষ এনে দাও শশি, আমি তাই খেয়ে মরি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না! হায়, হায়, কেন তোমার কথা শুনিনি!"

শশীরও দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল। সে স্বামীর মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল, "তুমি অমন কর না, ঠাণ্ডা হও, ভয় কি, আমার এই মাদুলিটি বেচে কাল সকালে উঠে

কাবুলিদের টাকা কটা ফেলে দিও। তারপর বাড়ীঘর বেচে লোকের টাকা ফেলে দিলেই হ'বে।" এই বলিয়া শশী মাদুলিটি খুলিয়া স্বামীর হাতে তুলিয়া দিল। সুরেশ নির্ব্বাক নিস্পন্দ হইয়া সেই ভাবে তাহার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া পড়িয়া রহিল।

এমন সময় পাশের ঘরে খুকী কাঁদিয়া উঠিল। শশী স্বামীকে ধীরে ধীরে শোয়াইয়া দিয়া খুকীর কাছে উঠিয়া গেল। তারপর খুকীকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্বামীর বুকের আছে বসাইয়া দিয়া কহিল, "খুকীকে কোলের কাছে নিয়ে শোও দিকি, কোন ভাব্না থাক্‌বে না, কোন ভয় থাক্‌বে না।"

সুরেশ দুই হাতে খুকীকে বুকের সঙ্গে চাপিয়া ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া পড়িয়া রহিল।

পরদিন প্রাতঃকালে শশী তাহার সেই সোনার মাদুলিটি বিক্রয় করিয়া কাবুলীওয়ালার দেনা পরিশোধ করিয়া দিল। তার পর অপরাপর দেনার যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া ফেলিল। সুরেশ স্ত্রীর কোন কার্য্যের প্রতিবাদ করিল না, শুধু জড়ের মত বসিয়া রহিল। দুই তিন দিনের মধ্যে শশী সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া এই সর্ব্বনেশে আলেয়ার আকর্ষণ হইতে সুরেশকে দূরে রাখিবার জন্য সুরেশের পৈতৃক আমলের জীর্ণ পল্লীভবনে গিয়া আশ্রয় লইল।

——:•:——

বিধবা

[১]

মায়া আসিয়া পিতৃগৃহে প্রবেশ করিল। হাতের নোহা ও সিঁথীর সিদূর তাহার চিরতরে ঘুচিয়া গিয়াছে। শুভ্রবস্ত্রে তাহার দেহ মণ্ডিত। যেন প্রভাত-শিশিরস্নাত কুন্দ ফুলটি!

তাহার স্বামীর মৃত্যুর পর এখনও এক পক্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। এই দুর্ঘটনার পর দুই তিন দিন অতিবাহিত হইতে না হইতেই কান্নাকাটির অন্তরে মায়ার শ্বশুরবাড়ীর আত্মীয়ারা তাহার চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ আলোচনা জুড়িয়া দিল।

একজন বলিল, "ধন্যি মেয়ে যাহ'ক।"

অপর একজন প্রৌঢ়া কহিল, "আশ্চর্য্য হ'বার কি আছে, একালের মেয়েদের যেমন শিক্ষা তেমনই ত হ'বে।"

অন্য একজন যুবতী অমনই গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "পিসিমার যেমন কথা, আমরা আর কি একালের মেয়ে নই, আমরাও আর লেখা পড়া শিখিনি, একালের মেয়ে হ'লেই কি সবাই ঐ রকমই হ'য়ে থাকে। যার যেমন স্বভাব!"

মায়ার অপরাধ, তাহার স্বামীর ব্যাধির প্রথম হইতে শেষ অবধি সে স্বামীর শিয়রে ঠায় বসিয়াছিল, কেহ তাহাকে উঠাইতে পারে নাই। লজ্জানম্র বধূটির মত অন্য এক ঘরের জানালার গরাদে ধরিয়া আকাশপানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সে অন্তরে দগ্ধ না হইয়া, বা চোরের মত এ-দরজা, সে-দরজার ফাঁক দিয়া উঁকি মারিয়া জন্মের শোধ তাহার স্বামীকে লুকাইয়া না দেখিয়া কেন সে অমন লজ্জাহীনার মত পাঁচজনের সাম্‌নে স্বামীর শিয়রে বসিয়া বসিয়া তাহার মাথায় কম্পিত হাতখানি বুলাইয়া দিয়াছিল, এইটাই তাহার গুরুতর অপরাধ! আর কাহারও স্বামীর কি কোন দিন এমন অসুখ হয় নাই!

মায়ার স্বামী মরিয়া গেলেন। সকলে হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু মায়া কাঁদিল না, পাষাণ-প্রতিমার মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল!

মায়ার শ্বশুর গোঁড়া হিন্দু। তাঁহারই আদেশক্রমে তাঁহার বৃদ্ধা ভগিনী আসিয়া মায়ার হাত হইতে চুড়ি কয়গাছি ও নোহাটী খুলিয়া লইলেন, সিঁথীর সিঁদূর মুছাইয়া দিয়া স্নান করাইয়া থান কাঁড়িয়া পরাইয়া দিলেন। তবুও সে কাঁদিল না। বৃদ্ধার সর্ব্বাঙ্গ

কাঁপিতেছিল কিন্তু সে নিশ্চল। বাঁ হাতের একগাছি শাঁখা কিছুতেই টানিয়া খোলা যাইতেছিল না, মায়া মাটিতে হাত ঠুকিয়া ঠুকিয়া সেটিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিল। তবুও মায়ার চোখ দিয়া এক ফোটা জল বাহির হইল না। মনে হইতেছিল তাহার চোখ দুটী নিঙড়াইয়া ফেলিলেও বিন্দু পরিমাণ জল বাহির হইবে না!

মন্দ লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। ভাল লোকে বলিলেন, "হয় মায়া পাগল হইয়া যাইবে, না হয় সে আত্মহত্যা করিবে।" কিন্তু মায়া কিছুই করিল না।

তাহার পিতা লইয়া যাইবার জন্য লোক পাঠাইতেই শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পদধূলি লইয়া সে পিত্রালয়ে চলিয়া আসিল।

যে কক্ষে তাহার স্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছিলেন, সেটি তাহারই শয়নকক্ষ। এ কয় দিন মায়া সেই ঘরেই পড়িয়াছিল। যাইবার দিন স্বামীর চটি জোড়া, দুইটী জামা ও দুই খানি কাপড়, যাহা তাহার স্বামী প্রায়ই পরিতেন, তাহা গোপনে বাক্সর মধ্যে লুকাইয়া আনিয়াছিল।

[২]

মায়ার পিতা পরেশবাবু কন্যার অকাল বৈধব্যের সংবাদ পাওয়া অবধি মনে মনে মস্ত তার্কিক হইয়া উঠিলেন। তাঁহার কন্যার এত রূপ ও এমন শিক্ষা মানুষের-গড়া সমাজের পীড়নে নিষ্ফল হইয়া যাইবে? তাঁহার কন্যা যে পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া মাত্র ষোড়শে

পদার্পণ করিয়াছে। তাহার উচ্ছ্বসিত যৌবনশ্রী যে সবেমাত্র কূলে কূলে ভরিয়া উঠিয়াছে। এই তরুণ বয়স হইতে শুধু সমাজের ভয়ে সে ব্রহ্মচারিণী হইয়া থাকিবে? ভাল খাইতে পাইবে না, পরিতে পাইবে না! যদি ভগবানের এমনই ব্যবস্থা হইত, তাহা হইলে মাথা পাতিয়া তিনি তাহা মানিয়া লইতেন। কিন্তু এক সমাজ বিধবার এইরূপ নির্য্যাতন অনুমোদন করিতেছে, আবার আর এক সমাজ যখন ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে, তখন কেন সেই পুরাতন সমাজের অধীনে থাকিয়া মেয়েটিকে তিনি আজীবন কষ্ট দিবেন?

পরেশের মনের অবস্থা যখন এইরূপ, তখন মায়া তাহার সম্মুখে আসিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল। কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া পরেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। দুই চোখ তাঁহার বাষ্পাকুল হইয়া উঠিল।

কয়দিন পরে পরেশ মায়াকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। এ বাড়ীটিও তাঁহার নিজের। তিনি বিপত্নীক। মায়াই এখন বাড়ীর কর্ত্রী হইল। সে বাড়ীটিকে দুচার দিনের মধ্যে বেশ গুছাইয়া লইল। একটা ঘর সে তাহার একেবারে নিজস্ব করিয়া রাখিল। সংসারের কাজকর্ম্ম যখন সে দেখিত, তখন ঘরটিতে বাহির হইতে সে তালা দিয়া রাখিত। বাড়ীর মধ্যে এ ঘরটিতে অন্য কাহারও প্রবেশ করিবার অধিকার ছিল না। পরেশ তাহা জানিতেন। তিনিও ভ্রমক্রমে কোনদিন সে ঘরের দিকে যাইতেন না।

কলিকাতায় আসিবার মাস খানেক পরে শ্বশুরবাড়ী হইতে মায়াকে লইতে আসিল। কিন্তু পরেশবাবু তাহাকে পাঠাইলেন না, বলিয়া দিলেন, মেয়ে তাঁহার নিকটেই বরাবর থাকিবে, শ্বশুরবাড়ী যাইবে না। মায়ার এক দেবর লইতে আসিয়াছিল, পরেশবাবু বাহির হইতে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন, মায়ার সহিত সাক্ষাৎ অবধি করিতে দিলেন না। এই দেবরটাকে মায়ার স্বামী খুব ভালবাসিতেন, মায়াও বাসিত। পিতার ব্যবহারে মায়া মনে মনে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইলেও মুখে কিছুই প্রকাশ করিল না।

এই লইয়া মায়ার পিতা ও শ্বশুর গৌরহরিবাবুতে রীতিমত বিবাদ বাধিয়া গেল। গৌরহরিবাবু পুত্রবধূকে কিছুতেই পিত্রালয়ে রাখিবেন না, এদিকে মায়ার পিতাও কিছুতেই কন্যাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইবেন না। মায়ার পিতারই শেষে জয় হইল, কারণ সে এখন তাঁহারই বাড়ীতে। নিস্ফল আক্রোশে পুত্র-শোকাতুর গৌরহরিবাবু মনের মধ্যে পুড়িতে লাগিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন তাঁহার এই পুত্রবধূটিকে বাড়ীর সর্ব্বময়ী কর্ত্রী করিয়া রাখিবেন। তাঁহার এই বৃহৎ পরিবারের সমস্ত গুরুভার বহন করিয়া মায়া তাহার দীর্ঘ ব্যর্থ জীবন কোন রকমে হয় ত টানিয়া লইয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু তাঁহার এ আশা অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।

[৩]

দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে মায়ার শ্বশুরবাড়ী হইতে আরও দুই তিন বার তাহাকে লইতে আসিয়াছিল, প্রথম-বারের মত এ কয়বারও মায়ার পিতা তেমনিভাবে তাহাদের বিদায় করিয়া দিয়াছেন।

এদিকে গৌরহরিবাবুও ক্রমে শয্যাশায়ী হইলেন। তিনি লোকপরম্পরায় শুনিলেন, তাঁহার পুত্রবধূর নাকি আবার বিবাহ হইবে। তাঁহার বৈবাহিক এই অভিসন্ধি করিয়াই কন্যাকে পাঠান নাই! পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধের অন্তরে এই সংবাদটি দারুণ বিঁধিল। তিনি কাঁদিয়া সবাইকে বলিতে লাগিলেন, "ওরে আমার বউমাকে একবার এনে আমায় দেখা, আমার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে তার বাপ তাকে কিছুতেই বিয়েতে রাজি করাতে পারবে না।" কখন বা গৌরহরিবাবু আপন মনে বকিতে থাকেন, "অ্যাঁ আমার বউমার বিয়ে হ'বে! আমার নিমাইয়ের বউ আবার বিয়ে কর্‌বে! সে যে বিধবার বিয়ে একবারেই দেখ্‌তে পার্‌ত না, ভগবান্ এমনি করে লোককে দগ্ধে দগ্ধে মার্‌তে হয়। ওরে আমার বংশে বিধবা বৌয়ের বিয়ে হ'বে! হা ভগবান!"

পরেশবাবু সত্যই গোপনে মায়ার জন্য পাত্র অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনটী পাত্রও তাঁহার বাড়ীতে যাতায়াত সুরু করিয়াছে। তাহার মধ্যে একটী যুবক বড় ঘন ঘন যাতায়াত

করিতেছে। পরেশবাবুও তাহার সহিত এমনই ব্যবহার করিতে-ছেন যেন সে এ বাড়ীর সহিত খুব ঘনিষ্ঠভাবে আবদ্ধ।

মায়া দূর হইতে তাহাকে দেখিয়াছে। এ মুখখানি তাহার পরিচিত বলিয়া বোধ হইল, কিন্তু ঠিক করিয়া উঠিতে পারিল না, সে কে?

প্রতিদিনই মায়া পিতার জন্য স্বহস্তে চা প্রস্তুত করিয়া ভৃত্যকে দিয়া বাহিরে পাঠাইয়া দিত, আজও পাঠাইয়াছিল। এমন সময় পরেশবাবু ডাকিলেন, "মায়া, একবার এদিকে এস ত মা?"

মায়া ভাবিল আজ বোধ হয় পিতা একাকী বসিয়া আছেন, তাই ডাকিতেছেন। আলুলায়িতকুন্তলা মায়া ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরের দরজার কাছে আসিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। সেই আগন্তুক যুবকটী তাহার পিতার পাশে বসিয়া হাসিতেছে। মায়ার মুখমণ্ডল সহসা আরক্তিম হইয়া উঠিল। অসংযত তৈলহীন কেশরাশির উপর আঁচলটী টানিয়া দিয়া সে সরিয়া যাইতেছিল, পরেশবাবু কহিলেন, "চলে যাচ্ছ কেন মা, এস, এখানে লজ্জা কর্‌বার কেউ নেই। এ যে আমাদের ঘরের ছেলে, ওকে চিন্‌তে পারচ না?"

মুহূর্ত্তের জন্য মায়া তাহার আয়ত নয়ন দুইটী সেই আগন্তুক যুবকটীর উপর স্থাপন করিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া লইল। যুবকটীর দুইটী নয়নের ছায়া মায়ার সেই আয়ত নয়নের উপর পড়িল। পরেশবাবু কহিলেন, "ও যে নিমাইয়ের,"—বলিয়া একটু থামিয়া

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া পুনরায় কহিলেন, "আমাদের নিমাইয়ের বন্ধু, তাদের ওখানে উনি কতদিন গেছেন, নিমাইয়ের সঙ্গে বসে কত রাত অবধি গল্প করে এসেছেন। তুমি চিন্‌তে পার্‌চ না মা?"

মায়া এবার চিনিল। এ নরেশ, তাহার স্বামীর বন্ধু। তাহার বিবাহের এক বৎসর পরে, তাহার স্বামীর এই বন্ধুটী তাহাকে অনেকগুলি বই উপহার দিয়াছিল, এবং তাহাকে উল্লেখ করিয়া তাহার স্বামীর সহিত কত কৌতুক করিয়াছিল। সেই যা একদিন মায়া তাহার সম্মুখে বাহির হইয়াছিল, তাহাও খুব গোপনে, তাহার শ্বশুরের অজ্ঞাতসারে। তাহার পর প্রত্যহই দুই বেলা এই বন্ধুটী তাহাদের বাড়ী আসিয়াছে, সে কিন্তু আর একদিনের জন্যও তাহার সম্মুখে বাহির হয় নাই। তখন ত তাহার ভাগ্য-লক্ষ্মী সুপ্রসন্ন ছিলেন, কিন্তু আজ যে তাহার কপাল পুড়িয়াছে! এই মুখ লইয়া কাহার জোরে, কোন্ সাহসে সে তাহার স্বামীর বন্ধুটীর সম্মুখে আবার নূতন করিয়া বাহির হইবে। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া মায়া সেই-খানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

পরেশবাবু অগ্রসর হইয়া সস্নেহে তাহার হাত ধরিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া আসিয়া কহিলেন, "আমি বল্‌চি মা, এঁকে দেখে লজ্জা কর্‌বার কিছু নেই।"

মায়া কোন উত্তর করিল না। তাহার সমস্ত দেহ মন কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতে লাগিল। পিতার আসনের পাশে নতমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল।

পরেশবাবুর সঙ্গে নরেশ নানাগল্প জুড়িয়া দিল। প্রথমে মায়ার স্বামী নিমাইয়ের কথা উল্লেখ করিয়া কহিল, নিমাই তাহাকে কত ভালবাসিত। একদিন তাহার সহিত দেখা না হইলে সে কত অস্থির হইয়া পড়িত। সেই বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ সুন্দর মানুষটীর ভিতরটীও তেমনই উদার ছিল। তারপর অন্য গল্প ফাঁদিল। নরেশ এমনই ভঙ্গী করিয়া এমন সুকৌশলে বর্ণনার পর বর্ণনা করিয়া যাইতে লাগিল যে, পরেশবাবু তন্ময় হইয়া তাহার সেই সমস্ত কথা গিলিতে লাগিলেন ও এক একবার কন্যার অবনত গম্ভীর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। শেষে একথা সে কথার পর হঠাৎ নরেশ পরেশবাবুকে কহিল, "দেখুন দেখি, নিমাই আমার অমন বন্ধু ছিল, আর সেই মায়া কিনা আমাকে দেখে এখন লজ্জা করে মুখ নীচু করে রয়েচে।"

মায়া ভাবিল, মন্দ নয়; ইতিপূর্ব্বে সে যেন নরেশের সঙ্গে বরাবরই গল্প করিয়া আসিয়াছে! মৃদুকণ্ঠে সে পিতাকে কহিল, "বাবা, আমি তবে এখন যাই, রাঁধতে অনেক বেলা হ'য়ে যাবে।"

নরেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "মায়া, তুমি রাঁধ্‌বে কি রকম? আজ কি তোমাদের ঠাকুর আসেনি?"

মায়া তাহার কথার কোন উত্তর দিল না, কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। পরেশবাবু কহিলেন, "আমার মা'টি কিছুতেই ঠাকুর রাখ্‌তে দেবে না। দুবেলা সবায়ের রান্না সে একলাই রাঁধে।"

যেন কত পরিচিতের মত নরেশ ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আপনি

ওর কথা শুনবেন না, ঠাকুর 'রেখে দিন, না হ'লে দেহটা একেবারে মাটি হ'য়ে যাবে।" কথাগুলি বলিয়া ফেলিয়া নরেশ লজ্জায় অন্তরের মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া উঠিল।

পরেশবাবু একটু হাসিলেন মাত্র।

[৪]

মায়া পরেশবাবুর শেষ বয়সের কন্যা। সাতটী পুত্রকন্যার মধ্যে সেই কেবল একলা অবশিষ্ট আছে। জ্ঞান হওয়ার পর হইতে তাহার বড় বড় পাঁচটি ভাই চার বৎসরের মধ্যে একে একে ইহধাম ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। এতগুলি সন্তানের শোক সহ্য করিতে না পারিয়া তাহার জননীও তাহাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

তাই মায়া নিজের সমস্ত দুঃখ অন্তরে চাপিয়া পিতাকে প্রফুল্ল রাখিতে চেষ্টা করিত। পিতা যাহা বলিতেন, কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে তাহা সে পালন করিয়া যাইত। তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল, তাহার স্বামীর সেই ঘরটিতে পড়িয়া থাকিয়া তাহার এই বড় দুঃখের জীবন সে অতিবাহিত করিবে, কিন্তু পিতার কথা ভাবিয়া তাহা সে পারিল না, বুক বাঁধিয়া পিতার কাছে চলিয়া আসিল।

কিন্তু শ্বশুরের জন্য মায়ার অন্তর প্রায়ই ব্যথিত হইয়া উঠিত। শ্বশুরগৃহে যাইবার জন্য সে এক একদিন মনে মনে অত্যন্ত অস্থির

হইয়া পড়িত। কিন্তু কি করিয়া সে যাইবে। তাহার পিতা ও শ্বশুরের বিবাদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া এমন জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে, এখন শ্বশুরবাড়ী যাইতে হইলে তাহাকে পলাইয়া যাইতে হয়, সেও অসম্ভব। আবার ভাবিত, তাহার শ্বশুরের আর দুইটী পুত্র সন্তান আছে কিন্তু তাহার পিতার সান্ত্বনার বস্তু আর কেহ নাই; সেই একা। দুইটী বিভিন্নপথগামী নদী প্রবাহের মাঝখানে পড়িয়া মানুষের অবস্থা যেরূপ হয়, মায়ার অন্তরের অবস্থা তদ্রূপই হইয়াছিল। পিতৃগৃহ হইতে যে সহজে বাহির হইতে পারিবে, এমন ভরসা তাহার রহিল না।

এদিকে পিতার কথায় প্রতিদিনই যখন সে নিজে হাতে করিয়া বাহিরে চা দিতে আসিত, পরেশবাবু তখন তাহাকে কিছুতেই যাইতে দিতেন না; সেখানে তাহার সহিত নানা গল্প জুড়িয়া দিতেন। এমনই করিয়া প্রতিদিন নরেশের সম্মুখে আসিতে আসিতে মায়ার সঙ্কোচটা অনেক কমিয়া আসিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি নরেশ তাহা লক্ষ্য করিয়া অন্তরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

প্রথমে মায়া কোন কথাই কহিত না; ক্রমে পরেশবাবুর সহিত যেন কথা কহিতেছে এমনভাবে নরেশের কথার উত্তর দিত। তারপর সোজাসুজি নরেশের সঙ্গে কথা কহিতে লাগিল।

সেদিন পরেশবাবুর ঘরের মেঝের উপর মায়া বসিয়াছিল। পরেশবাবু চেয়ারে বসিয়া কি লিখিতেছিলেন। মায়ার অযত্নবর্দ্ধিত এলোমেলো কেশদাম সমস্ত পিঠ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। ভোরের

মৃদু হাওয়ায় দু একগাছি স্থানভ্রষ্ট হইয়া এদিক ওদিক উড়িতেছিল। প্রভাত সূর্য্যের ঈষৎ রক্তিম কিরণ মায়ার চোখে মুখে পড়িয়া এক অভিনব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিয়াছিল। দুই পা ছড়াইয়া দিয়া কোলের উপর একখানি বই রাখিয়া মায়া ঝুঁকিয়া বসিয়া একমনে তাহাই পড়িতেছিল।

বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া নির্ণিমেষ নয়নে নরেশ এই শুদ্ধান্তচারিনী ব্রহ্মচারিণীকে দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে তাহার দেহমন এক অভিনবভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার হাতে একখানি বই ছিল, সেখানি সহসা পড়িয়া গেল। তাহারই পতনশব্দে মায়া সেই দিকে ফিরিতেই নরেশের বিহ্বল দৃষ্টির সহিত তাহার গম্ভীর অচঞ্চল দৃষ্টি সম্মিলিত হইল। মায়ার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি তাহার লুণ্ঠিত অঞ্চল টানিয়া লইয়া মাথায় কাপড় দিয়া জানালার পাশে গিয়া দাঁড়াইল।

নরেশ এতক্ষণ সেইখানে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। পরেশের আহ্বানে তাহার চমক ভাঙ্গিয়া গেল। সে বইখানি কুড়াইয়া লইয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "মায়া, দেখ তোমার জন্যে কেমন এক-খানি বই এনেছি। নতুন বেরিয়েছে, পড়ে দেখ, খুব ভাল বই।"

মায়া তখনও বোধ হয় প্রকৃতিস্থ হইতে পারে নাই; তাই নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া অপরাধীর মত মুখ করিয়া কহিল, "এ বই নিয়ে আমি কি করব?"

নরেশ হাসিয়া কহিল, "খুলেই দেখ না, তা হ'লেই বুঝ্‌তে পারবে।"

মায়া তাহার কম্পিত হস্তে বইখানি লইয়া খুলিয়া দেখিল, পরিষ্কার ঝরঝরে অক্ষরে তাহারই নাম লেখা। তাহার নীচে নরেশের নাম। নরেশ তাহাকে এই বইখানি উপহার দিয়াছে।

মায়ার সমস্ত শরীরটা জ্বালা করিয়া উঠিল। নরেশ বই উপহার দিবার কে? যে হাতে সে বইখানি ধরিয়াছিল, তাহার মনে হইল, সে হাতটীতে কে যেন তপ্ত লৌহশলাকা বিদ্ধ করিয়া দিল। তাহার ইচ্ছা হইতে লাগিল বইখানি কুটিকুটি করিয়া ছিঁড়িয়া রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। এমন সময় পরেশবাবু চিঠি লেখা শেষ করিয়া মায়ার দিকে ফিরিয়া কহিলেন, "দেখি মা, নরেশ তোমার জন্যে কি বই এনেচে?"

মায়া যেন রক্ষা পাইল। পিতার হাতে বইখানি তুলিয়া দিল। এ-পাতা সে-পাতা উল্টাইয়া দেখিয়া তিনি কহিলেন, "বেশ বই।" এই বলিয়া তিনি মায়াকে বইখানি ফিরাইয়া দিলেন।

[৫]

ক্রমে ক্রমে নরশের প্রতি পরেশবাবু ভারি আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। তিনি মনে মনে তাহাকেই তাহার বিধবা কন্যার ভাবী স্বামী স্থির করিয়া অনেকটা সুস্থ হইলেন।

নরেশও নানাপ্রকারে পরেশবাবুর মন যোগাইয়া চলিতে

লাগিল। যখন পরেশবাবু বিধবাবিবাহের স্বাপক্ষে খুব উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করিতেন, নরেশ তখন প্রফুল্ল মুখে তাঁহার কথায় সায় দিয়া যাইত। কন্যার মুখের পানে চাহিয়া তিনি এমনই উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন যে, তাহার সম্মুখেই তিনি বিধবাবিবাহের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা জুড়িয়া দিতেন। তিনি মনে করিতেন, মায়া ইহাতে খুব সন্তুষ্ট হইবে, কিন্তু এ আলোচনার সূত্রপাতেই মায়া অন্যত্র উঠিয়া চলিয়া যাইত।

মায়ার শ্বশুর গৌরহরিবাবু এখনও নানাপ্রকারে পরেশকে নিরস্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমন কি শেষে ভয় দেখাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, পরেশ যদি এমন কাজ করেন, তিনি তাহার পুত্রবধূকে জোর করিয়া কাড়িয়া লইয়া আসিবেন।

ইহাতে পরেশবাবুর জেদ আরও বাড়িয়া গেল। গৌরহরিবাবুর এতদূর সাহস,—আমার বাড়ী হইতে আমার মেয়েকে কাড়িয়া লইয়া যাইবেন! পরেশবাবু মনে করিয়াছিলেন, আরও কিছুদিন পরে মায়ার বিবাহের আয়োজন করিবেন, কিন্তু আর দেরী করা হইল না। মায়ার বিবাহের দিন স্থির করিয়া নরেশকে প্রস্তুত হইতে বলিলেন। মায়াও এ সম্বাদ শুনিল।

সে দিন শীতের মধ্যাহ্ন। সকলের খাওয়া দাওয়া হইয়া গিয়াছে। পরেশবাবু বাহিরের ঘরে বসিয়াছিলেন। মায়া নিজের ঘরের ভিতর উন্মুক্ত দরজার সুমুখে দুই হাতের মধ্যে মুখ

চাকিয়া উপুড় হইয়া মেঝের উপর পড়িয়াছিল। চোখের জলে তাহার নিরাভরণ হাত দুইটী ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার মনের মধ্যে অনুক্ষণ জাগিতেছিল, এ সম্বাদ নিশ্চয়ই এতক্ষণে চারি-দিকে রাষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার শ্বশুরবাড়ীতেও এ সম্বাদ এতক্ষণে পৌঁছাইয়াছে। আহা, তাহার শ্বশুর এতক্ষণ কি করিতেছেন! পুত্র-শোকের উপর এ আঘাত তিনি কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবেন না! তুচ্ছ বধূর জন্য তাহার-শ্বশুরবাড়ীর পবিত্র বংশগৌরবে চিরদিনের মত এত বড় একটা কালিমা পড়িবে! লজ্জায় ঘৃণায় ও ক্ষোভে মায়ার আত্মহত্যা করিতে ইচ্ছা হইতেছিল। সে যদি অমন করিয়া নরেশকে প্রশ্রয় না দিত, সে দিন অমন করিয়া নীরবে নরেশের উপহার গ্রহণ না করিত, যদি অমন নির্লজ্জের মত তাহার সহিত কথা না বলিত, তাহা হইলে কখনও তাহার পিতা এ বিবাহের আয়োজন করিতে পারিতেন না। তাহার পিতারই বা দোষ কি? শোকজর্জ্জরিত পিতা কন্যাকে সুখী করিবার জন্যই একাজে অগ্রসর হইয়াছেন। সে যে তাহার পিতার একমাত্র সান্ত্বনার বস্তু, সে কি করিয়া আত্মহত্যা করিবে।

কিন্তু তাহার এই দেহ মনের উপর তাহার নিজেরও যে কোন অধিকার নাই। এ দেহমন যে বহুদিন পূর্ব্বে আর এক জনকে উৎসর্গ করা হইয়া গিয়াছে। ভগবান বলিয়া দাও সে এখন কি করিবে?

সব চেয়ে তাহার রাগ হইল নরেশের উপর। সে যে তাহার স্বামীর বড় বন্ধু ছিল, আর তাহারই এই কাজ! সে-ই ত নানা কৌশল করিয়া তাহার পিতাকে এ বিবাহে মত করাইয়াছে! মায়া আর ভাবিতে পারিতেছিল না! তাহার চিন্তা-শক্তি যেন ক্রমেই অসাড় হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় হাসিতে হাসিতে নরেশ মায়ার উন্মুক্ত গৃহদ্বারের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বিস্ময়বিস্ফারিত নয়নে দেখিল, ভূলুণ্ঠিতা মায়ার অদূরে একটী বেদীর উপর মায়ার স্বামীর একখানি চিত্র সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে, তাহারই ঠিক নীচে এক জোড়া পুরাতন চটি এবং এক পাশে দুইখানি কাপড় ও দুইটী জামা পড়িয়া আছে। বেদীর সম্মুখে পূজার সমস্ত উপকরণ, বিল্বদল, ফুল কোশাকুশি প্রভৃতি ছড়ান রহিয়াছে, যেন এই মাত্র কে পূজা করিয়া উঠিয়া গিয়াছে। দূরে গৃহকোণে তাহারই প্রদত্ত সেই ভক্তি-উপহারখানি খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। নরেশ কি বলিতে আসিয়াছিল, তাহা ভুলিয়া গেল। শুধু একবার "মায়া" বলিয়া ডাকিয়াই আড়ষ্ট স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তাহার কণ্ঠস্বরে মায়া ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া দুই হাতে দুই চৌকাট ধরিয়া বিস্ফারিত অচঞ্চল দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিল। মায়ার আয়ত নয়ন দুইটি ধ্বক্‌ধ্বক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। খানিকক্ষণ এইভাবে দাঁড়াইয়া থাকিবার পর মায়া দৃঢ়কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "এ ঘরে প্রবেশ কর্‌বার অধিকার তোমার

নেই। এ ঘরে আমার দেবতা আছেন। এ দেবতার মন্দির তোমার মত লোকের স্পর্শে আমি কিছুতেই কলুষিত হ'তে দেব না।"

এত দিন মায়া অন্তরে জ্বলিয়া পুড়িয়া গেলেও পিতার মুখ চাহিয়া সমস্ত যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করিয়া আসিয়াছে, চোখ ফাটিয়া জল বাহির হইতে চাহিলেও সে কঠিন হইয়া এক ফোঁটা জল বাহিরে আসিতে দেয় নাই; আজ সুযোগ বুঝিয়া সেই শৃঙ্খলিত যন্ত্রণা ও রুদ্ধ অশ্রু একযোগে তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। তাহাদের প্রচণ্ড বেগ মায়া কিছুতেই সহ্য করিতে পারিল না, আরাধ্য দেবতার মন্দির দ্বারে চৈতন্য হারাইয়া লুটাইয়া পড়িল। সেই পতন শব্দে তাহার পিতা ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তখনও তাহার দেহ একটু উষ্ণ ছিল। তারপর দেখিতে দেখিতে পিতার ক্রোড়ের উপর তাহার দেহ হিমশীতল হইয়া গেল!

——:*:——
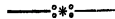
দিদির পত্র

[১]

ভাই সুরো, অনেকদিন তোর সঙ্গে দেখা হয় নাই, তাই তোকে দেখিবার জন্য মনটা বড় অস্থির হইয়াছে। বড় আশা ছিল, সুকুর বিয়েতে তোর সঙ্গে দেখা হইবে, কিন্তু আমার সে আশা পূর্ণ হইবার নহে; তবে তুই যদি অজিতকে বলিয়া ফিরিবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করিয়া যাস্, তাহা হইলে তোর জামাইবাবু ও আমি যে কত খুসী হইব, তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে।

তুই বোধ হয় এতদিন নিশ্চয়ই শুনিয়াছিস্, কেননা আমি জানি, মেজপিসি এ কথা কাহাকেও জানাইতে বাকি রাখেন নাই,—তবুও আমিই তোকে এ কথা জনাইতেছি যে, আমার

শ্বশুরবাড়ীর এঁরা আমার তিনখানি গহনা বন্ধক দিয়াছেন। যে অবস্থায় গহনা কয়খানি বন্ধক পড়িয়াছে, সে অবস্থায় পড়িলে অপরে কি করিত তাহা জানি না; যাক্‌গে, সে কথার আর উল্লেখ করিব না—উল্লেখের দরকারই বা কি?

দিন পনর আগে আমি একবার বাপের বাড়ী গিয়াছিলাম, সেই সময় আমার গায়ে ঐ তিনখানি গহনা না দেখিয়া মেজপিসি প্রথমে হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করেন, "তোর অমুক অমুক গয়না যে দেখ্‌তে পাচ্ছি না? তোর শ্বাশুড়ী মাগী বুঝি বন্ধক দিয়ে খেয়েছে?" মেজপিসি যে এ কথাগুলো তখন ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, তাহা বুঝিলাম। কিন্তু আমি সত্য কথা গোপন করিলাম না, বন্ধক দেওয়ার কথা খুলিয়া বলিলাম। অমনই মেজপিসি গালে মুখে চড়াইয়া চীৎকার করিয়া বাড়ীর আর পাঁচজনকে জড় করিলেন। তখন, 'কেন বন্ধক দিয়াছে, এত অভাব তাদের কিসে হইল যে, বউয়ের বাপের দেওয়া গহনা বন্ধক দিতে হইয়াছে,' এই প্রকারের নানা প্রশ্ন নানা জনে করিতে লাগিল। আমার শ্বাশুড়ী ও তোর জামাই বাবুর নাম করিয়া কত জনে কত কথা বলিতে আরম্ভ করিল। আমি নীরবে সমস্ত শুনিয়া গেলাম, কোন উত্তর দিলাম না। কেন না, ইহাদের কোন কথার উত্তর দেওয়া আমি একেবারেই আবশ্যক মনে করিলাম না, এবং এখনও করি না। মেজপিসি গিয়া তৎক্ষণাৎ বাবাকে এ কথা জানাইয়া আসিলেন। তোর কাছে

কোন কথা লুকাইব না, আমার সত্যিই ইচ্ছা ছিল, কয়দিন ওখানে থাকিয়া সুকুর বিয়ের পর এখানে আসিব, কিন্তু তখন মেজপিসির উপর ভারি রাগ হওয়ায় সেই দিন সন্ধ্যার সময় এখানে চলিয়া আসিলাম।

[২]

এক সপ্তাহ পরে মেজপিসির লেখা দুইখানি পত্র আসিল, একখানি আমার নামে, আর একখানি আমার শ্বাশুড়ীর নামে। মেজপিসি আমাকে লিখিয়াছেন, "সুষি, তুই ছেলের মা হ'য়েছিস, তবুও এখন নিজের ভালমন্দ বুঝ্‌তে পার্‌লি না। কার অদৃষ্টে যে কখন কি হয় তা কেউ বল্‌তে পারে না। তুই যে ঘরে পড়েছিস, যতদূর বুঝ্‌তে পারছি ওই গয়না ক'খানাই তোর সম্বল। ভগবান না করুন, যদি সরলের (সরল সুষমার স্বামীর নাম) ভালমন্দ কিছু হয় তখন মেজদাদার কাছে এসেই তোকে পড়তে হ'বে, সে সময় দু'চারখানা গয়না থাক্‌লে কতটা ভরসা বল দিকি ? যাক্, তোকে যা বলছি তাই করিস। সরলকে বলিস, সে যেমন করে পারে গয়নাগুলো যেন খালাস করে দেয়। কেঁদে-কেটে পারিস্, যেমন করে পারিস্ গয়নাগুলো আদায় কর্‌বি। সুকুর বিয়ের সময় সবাই আস্‌বে, ও কথা আর কারো জান্‌তে বাকি থাক্‌বে না; সবাই যে তোকে ছি ছি করবে, আমাদেরও মাথা কাটা যাবে। মেজদাদা সেই দিন থেকে ভাল করে খান না; কেবলই কাঁদছেন

আর বলচেন—কত সাধ করে গয়নাগুলো গড়িয়ে দিয়েছিলাম, আর এমনই করে কিনা নষ্ট করলে? তুই কিছু বুঝিস্ নি, তাই বল্‌ছি এর ভেতর তোর শ্বাশুড়ী মাগীর কারসাজি আছে। * * * * এ চিঠিখানি তোর শ্বাশুড়ীকে দেখাস্‌নি।"

সুরো তোকে আর কি বলিব। আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলিতে লাগিল। তখনও আমি শ্বাশুড়ীর পত্রখানি পড়ি নাই, না পড়িলেও এটুকু বুঝিলাম, মেজপিসি তাঁহাকেও গহনা সম্বন্ধে কিছু লিখিয়াছেন। ছি, ছি, আমার শ্বাশুড়ী কি মনে করিলেন, তিনি নিশ্চয়ই ভাবিয়াছেন, আমি গহনার কথা ও বাড়ীর সবাইকে লাগাইয়াছি। আমার বুক ফাটিয়া কান্না বাহির হইতে চাহিল। হা ভগবান, কেন আমার এ শাস্তি করিলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্বাশুড়ীর সহিত আমার দেখা হইল। তখন আমি আর কান্না চাপিতে পারিলাম না, চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া বলিলাম, "মা আমি ওঁদের আগে কিছু বলিনি—মেজপিসি গয়নার কথা তোলায় আমি সত্যি কথা বলেছিলাম—তিনি যা তা বল্‌তে লাগ্‌লেন বলেই সে দিন আমি চলে এসেছি।"

তিনি আমায় সস্নেহে তুলিয়া বলিলেন, "চুপ কর লক্ষ্মী মা আমার, কেঁদ না, আমি কি তোমায় চিনিনি যে, তুমি আমায় ও সব কথা বল্‌চ।"

[৩]

উনি আপিস হইতে ফিরিয়া আসিবার ঘণ্টা খানেক পর মা তাঁহাকে বলিলেন, "বাবা, বউমার গয়না তিনখানা কি করে খালাস করে আনি বল্ দিকি ?"

তিনি বলিলেন, "তার জন্যে এত তাড়াতাড়ি কিসের মা ?"

মা বলিলেন, "৭ই বউমার বোনের বিয়ে, সে সময় গয়না পরে না গেলে যে বউমার বাবা পাঁচ জনের কাছে মুখ দেখাতে পারবেন না। তুই বাবা কোন রকমে গয়না ক'খানা এনে দিতে পারবিনি ?" এই বলিয়া তিনি সেই পত্রখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলেন।

বারান্দায় বসিয়া তাঁহাদের দুই জনের কথাবার্ত্তা হইতেছিল, আমি ঘরের ভিতর আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া তাহাই শুনিতেছিলাম। দেখিলাম, তিনি চিঠিখানি শেষ করিয়া খানিকক্ষণ মাথায় হাত দিয়া বসিয়া রহিলেন। তার পর মাকে বলিলেন, "আচ্ছা, দেখি চেষ্টা করে, যেমন করে পারি তাদের গয়না এনে দেব।" তিনি বারান্দা হইতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। আল্‌নায় জামা টাঙান ছিল, তাহা পাড়িয়া গায়ে দিলেন। আমার দুই চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। তিনি আমার দিকে চাহিয়া তাহা দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "কাঁদ্‌চ কেন, আমি চুরি করে পারি, জোচ্চরি করে পারি, আজ রাত্রির মধ্যেই

তোমার গয়না এনে দেব।" কে যেন আমার সারা দেহের মধ্যে তপ্তশলাকা বিঁধাইয়া দিল। আমি অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতে লাগিলাম। তিনি ঘর হইতে বাহিরে যাইতে উদ্যত হইলে, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিলাম, "তুমি যেতে পার্‌বে না; যারা গয়নার কথা লিখেছে, গয়না তাদের, না তোমার? তোমার জিনিস, তুমি যা খুসী তাই কর্‌বে, তারা বল্‌বার কে?"

তিনি আমার এই কথা শুনিয়া খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন, তার পর আম্‌তা আম্‌তা করিয়া কহিলেন, "না না সে জন্যে আমি কিছু মনে করি নি, বিয়েতে শুধু গায়ে যাবে, তাই গয়নাগুলো কোন রকমে নিয়ে আসি।"

আমি উত্তেজিত হইয়া বলিলাম, "না গয়না তুমি কিছুতেই আন্‌তে পারবে না। আমার জন্যে তুমি ভেব না,—যারা তোমাকে ও মাকে অত বড় কথা লিখ্‌তে পারে, তাদের বাড়ীমুখো আমি হ'চ্ছি না, এ বিয়েতে যাওয়া ত দূরের কথা!"

তাঁহার মুখখানি এতক্ষণ যেন কালো মেঘে ঢাকা ছিল, সহসা তাহা শরতের আকাশের মত নির্ম্মল হইয়া উঠিল। তিনি জামাটি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে গিয়া মাকে বলিলেন, "মা যখন আমাদের সুবিধে হ'বে তখন গয়না আনব, পরের কথায় কেন মাথা ঘামাতে যাই।"

আমার শাশুড়ী বা আমি কেহই মেজপিসির পত্রের উত্তর

দিই নাই। ও রকম চিঠির আবার উত্তর কিসের! তা ভাই আমার জবানি মেজপিসিকে বলিস, বাবা আমাকে যাঁ হাতে সঁপিয়া দিয়াছেন, তাঁহারাই আমার ভালমন্দ দেখি বাবা যখন গহনা দানই করিয়াছেন, তখন সে গহনার জন্য আবার দুঃখ কিসের?

যাক্, এ সম্বন্ধে আর বেশী কিছু আমার বলিবার নাই ভাই, শুধু এই কথাটী জানাস্ যে, আমার শ্বশুরবাড়ীর এঁরা দুঃখী, গহনা বন্ধক দিয়া কোন রকমে এঁদের দিন চলে— সঙ্গে ও বাড়ীর কেহ যেন কোন সম্বন্ধ না রাখেন, তাঁহারা মনে করেন, সুষমা বলিয়া তাঁহাদের যে মেয়ে ছিল, সে গিয়াছে। তাহা হইলে তাঁহাদের আর মাথা কাটা যাইবার ভয় থাকিবে না। হাত পা বাঁধিয়া যাহাকে বহুপূর্ব্বে জলে দেওয়া হইয়াছে, তাহার জন্য এখন ভাবনা কিসের ভাই?

যদি তুই গরীব বলিয়া বড়দিদিকে আর সবাইয়ের ঘৃণা না করিস্, তবে ফিরিবার সময় আমার সহিত দেখা যাস্। এক বেলা তোদের দুমুটো খাইতে দিতে পারিব। তোর দিদি।

—:*:—